রসময় গৌরসুন্দর

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

রসময় গৌরসুন্দর

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ ঃ
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী ১৪০৫ সন

প্রকাশক ঃ
শ্রীবিভূতি ভূষণ সরকার
পি ৮২ সি আই টি রোড
স্কিম নং ৬ এম
কলিকাতা-৭০০০৫৪

মুদ্রণে ঃ
অবিনাশ রায়
শান্তি প্রেস
১ নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড
কলিকাতা-৭০০০১১

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
বাগানিয়া পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

প্রকাশকের নিকট

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার পরম প্রীতিভাজন অগ্রজ প্রতিম
ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহোদয়ের শ্রীকরকমলে

প্রীতিবাসিতা

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধার্ঘ্য

কলিযুগাবতার পতিতপাবন প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর সর্বোপরি কৃষ্ণস্বরূপে যে রসপিপাসার অপূর্ণতা ছিল—সেই আস্বাদনের পূর্ণতার জন্যই ব্রজরাজনন্দন আজ কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ। ব্রজের অপূর্ণ সাধ পুরাইতে আজ ব্রজের কানাই নদীয়ার গৌর হয়েছেন। মহাজন বলেছেন—

ব্রজের কানাই হইল গৌর
আর ব্রজের বলাই হইল নিতাই

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণায় আজ এক শুভক্ষণে মাঘীশুক্লা ত্রয়োদশী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিকে উপলক্ষ্য করে রসময় গৌরসুন্দর গ্রন্থ রূপে প্রকাশ পেলেন। এখানে প্রথমেই একটু নিবেদন জানিয়ে রাখি এবং মুদ্রণের ত্রুটিটুকুও অকপটে স্বীকার করি। এই গ্রন্থের শিরোনামা কিন্তু 'রসময় গৌরকিশোর' ছিলেন। এ অক্ষরটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদরের নামকরণ আমার শ্রীগুরুমহারাজ ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখনির্গলিত স্বতঃস্ফুর্ত্ত অক্ষর। কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে বারে বারে আস্বাদন করেছেন—আরে আরে আরে আমার গৌরকিশোর বর

রসে তনু ঢর ঢর
গৌর কিশোর বর
নবকৈশোর নটবর গোপবেশবেণুকর

সুতরাং গ্রন্থের নামকরণ ছিল রসময় গৌরকিশোর। কিন্তু মুদ্রণ কাজের ত্রুটিতে তার একটু পরিবর্ত্তন হয়ে গেল—গৌরকিশোরের পরিবর্ত্তে হয়েছে গৌরসুন্দর। যখন এ ত্রুটি দৃষ্টিতে পড়ল—তখন আর সংশোধনের উপায় ছিল না। তাই রসময় গৌরসুন্দর, এই নামকরণেই গ্রন্থ প্রকাশ পেলেন। এতে মনে

একটু ব্যথা লেগেছে কারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ নির্গলিত অক্ষরের পরিবর্ত্তনে। কারণ আমার শ্রীগুরুমহারাজ যাঁর জীবনের ব্রত শ্রীনামকীর্ত্তন তাতে মহাজন পদাবলীর ওপর যখন অক্ষর দিয়েছেন তখন নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল না। তাঁর অন্তরের প্রতিটি অক্ষরই শ্রীগুরুমহারাজের কৃপার দান। তাই তাঁর শ্রীমুখনির্গলিত কীর্ত্তন গ্রন্থের নামকরণ হয়েছেন 'শ্রীগুরুকৃপার দান'—এটি তারই ইচ্ছায়। সবটিই দানে পাওয়া। দানে পাওয়া বস্তুতে নিজের কর্ত্তৃত্ব থাকে না। অভিমান থাকে না আমি রোজগার করেছি। কারণ দান বলতে সবটাই কৃপাই বুঝায়। কারণ শ্রীপাদের কীর্ত্তনের কোন অক্ষরকে যখন কোন ভক্ত আস্বাদন করে নিজের বুদ্ধিতে তার একটু পরিবর্ত্তন করতে চাইতেন বলতেন —বাবা, এই অক্ষরের পরিবর্ত্তে এই অক্ষর দিলে ভাল হত না? শ্রীগুরুমহারাজ মৃদুস্বরে বলতেন—'কথা তো ভাল—কিন্তু যখন আঁচল পেতে ভিখারীর মত বসেছিলাম তখন তিনি (তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীল রাধারমণ চরণ দাস দেব) তো সেটি দেন নি। তিনি যা দিয়েছেন সেইটিই পেয়ে ধন্য হয়েছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এ নিষ্ঠা এ আনুগত্য জগতে দুর্লভ। শ্রীগুরুচরণে একান্তভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিতে না পারলে এ অবস্থা সম্ভব হয় না। সুতরাং রসময় গৌরকিশোরের পরিবর্ত্তে 'রসময় গৌরসুন্দর' নামকরণ হওয়ায় প্রাণে ব্যথা তো লেগেছেই—উপরন্তু একটু সঙ্কোচও এসেছে। কিন্তু নেহাৎ কোন উপায় ছিল না—কারণ মুদ্রণ কাজ তখন শেষ পর্য্যায়ে। তাই ভক্ত সুধী পাঠকবৃন্দের শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণতি জানিয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।

অবশ্য শ্রীগৌরসুন্দর তো চিরসুন্দর—এখানে গৌরসুন্দর এবং গৌরকিশোর—এর মধ্যে কোনও পার্থক্য হতে পারে না। রসে ভরপুর শ্রীগৌরকিশোরের এই রসের আস্বাদনের উচ্ছলনটি জগৎ

আজ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু—যিনি গৌর আনা ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে বসে বলেছেন—'প্রভু তুমি যে শ্যামামৃত অঞ্জলিভরে পান করছ এবং তাতে ভরপুর হয়ে আছ আমরা তোমার চরণপ্রান্তে বসে তোমার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যে বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ছে তাই আস্বাদন করে আমরা কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছি। অশেষবিশেষে রসভোক্তা এই গৌরসুন্দরকে রসের যোগান দিয়ে দিয়ে রসরত্নখনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর রসদানের সীমা না পেয়ে কলিজীবের কাছে কাতর হয়ে রসভিক্ষা করেছেন—বলেছেন—

ওরে ও কলিজীব আমায় রস দে রে,
আমি রস দেব রসপিপাসু শ্রীগৌরাঙ্গেরে।

তখন কলিজীব বলে—ঠাকুর তুমি তো রসরত্নখনি তুমি আবার আমাদের কাছে রস (প্রেম) চাইছ—আমরা রস পাব কোথায়? আমরা একান্ত কলিহত দুর্গত জীব। তখন নিতাই চাঁদ বললেন—

ওরে আমার রসের ভাণ্ডার বুঝি খালি হয়ে গেছে। অশেষ-বিশেষে রসভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দরকে রসের যোগান দিয়ে দিয়ে আমার ভাণ্ডারে বুঝি রস নেই তাই তোরা আমায় রস দে। কলিজীব বলে—ঠাকুর আমরা রস পাব কোথায়? নিতাইচাঁদ বলেন—তোরা যদি মুখে একবার গৌর বলিস তাহলেই আমি রস পেয়ে যাব। এইটি হল রসরত্নখনি নিতাইচাঁদের রসের কাঙ্গালপনা। কিন্তু খনির তো কাঙ্গাল হওয়ার কথা নয়। খনি পূর্ণস্বরূপ আর কাঙ্গালপনা তো হল অভাব। পূর্ণস্বরূপের অভাব থাকা তো সম্ভব নয়। তাই শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন—অন্তরের অনুভব মিশিয়ে অক্ষরে প্রকাশ করলেন—

রসখনির এই তো স্বভাব
পূর্ণ হয়েও মানে অভাব।

এ অন্য খনির স্বভাব নয়। শুধু রসখনিরই এই স্বভাব! সে স্বরূপে পূর্ণ হয়েও নিজেকে অভাবগ্রস্ত বলে মনে করে—এইটি প্রেমের স্বভাব রসের স্বভাব। কারণ প্রেম বা রস কখনও পূর্ণ হতে জানে না। প্রেমের অপূর্ণতা স্বরূপই হল প্রেমের স্বভাব—এ না হলে প্রেম মানায় না। প্রেম বা রস যদি পূর্ণ হয় তাহলে তার মর্য্যাদা থাকে না। অপূর্ণতা, রিক্ততাই হল প্রেমের শোভা প্রেমের গৌরব। প্রাকৃত জগতেও এর ছায়া আছে। পিতা-মাতা সন্তানকে ভালবেসে কখনও তৃপ্ত হতে পারে না—মনে করে যদি সন্তানকে আরও বেশী ভালবাসতে পারতাম। কায়া থাকলেই ছায়া থাকবে। ও জগতে কায়া আর এ জগতে তারই ছায়া কাজেই রস বা প্রেম পূর্ণ হবে কি করে? এই সূত্রেই রসরাজ শ্রীগোবিন্দ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্বরূপে রসগত তিনটি বাসনা জাগল যে বাসনা পূরণ গোবিন্দস্বরূপে সম্ভব হল না আশ্রয়-বিষয় জাতির বাধা বলে। কারণ গোবিন্দস্বরূপে বাসনা বলতে বিষয় জাতির বাসনাকে বুঝায়। তাঁর ইচ্ছা হয়েছে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদনের। রাধারাণী তো আশ্রয়জাতি। বিষয়জাতি শ্রীগোবিন্দের বাসনা জাগল আশ্রয়জাতি রাধারাণীর প্রেমাস্বাদনের। কাজেই এটি বিজাতীয় বাসনা। তাই গোবিন্দস্বরূপে থেকে সেটি পূরণ করা সম্ভব হল না। রাধাভাবে বিভাবিত হতে পারলে অর্থাৎ রাধারাণী হতে পারলে বিষয়জাতি আশ্রয়জাতি হতে পারলে তবে আশ্রয়জাতির আস্বাদন পাওয়া সম্ভব হবে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

এ তিনবাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ
কি করিবে না পাইয়া ওর
তখন ভাবিয়া দেখিলা মনে শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।

তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেমগুরু করি
নদীয়াতে করল উদয় ॥

রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে অর্থাৎ রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে গোবিন্দ যখন নদীয়াতে অবতীর্ণ হলেন এই কলিযুগে তখন তিনিই তো শ্রীগৌরসুন্দর নটরাজ। এই গৌরস্বরূপে তাই ব্রজের গোবিন্দস্বরূপের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হল। ব্রজের কানাই নদীয়ার গৌর হলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রস আস্বাদন-এ স্পর্শ করা তো দূরের কথা আমার মত দীনহীনার পক্ষে সেটি ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে চিন্তাও করা যায় না —'রসময় গৌরসুন্দর' শ্রীনবদ্বীপ পুরন্দরের রসের লোলুপতার প্রকাশ আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে একান্ত সম্বল করে এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস। এতে সুধী রসাস্বাদী ভক্তবৃন্দ পাঠক পাঠিকাগণ যদি বিন্দু মাত্র স্পর্শ পান তাহলে নিজেকে ধন্যাতিধন্যা অহো তাহা ভাগ্য বলে মনে করব।

পরিশেষে এইটুকু প্রাণের আকুতি না জানিয়ে পারছি না। একে কৃতজ্ঞতা বললে অনেক ছোট করা হয়। আমার অগ্রজ-প্রতিম দাদা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহোদয়—যিনি এ জগতে ধনী সেটি বড় কথা নয়—তিনি প্রেমধনে ধনী তাই তাঁর সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের শ্রীচরণে তাঁর অটুট স্বাস্থ্য, অপার শান্তি এবং সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। তাঁর আনুকূল্যে বৈষ্ণবসেবা, সমাজসেবা, দেশের সেবা আরও দীর্ঘদিন ধরে হোক্—এইটিই একান্ত কামনা।

আর মুদ্রণ কাজে আমার পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত অবিনাশ দাদা (শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় মহাশয়) যে যত্ন এবং পরিশ্রম স্বীকার

করেছেন তাঁর তুলনা হয় না। শ্রীনিতাই গৌর শ্রীচরণে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন অপার শান্তি স্বাস্থ্য প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী-১৪০৫
বাগানিয়া পাড়া
"রবীন্দ্র নিকেতন"
নবদ্বীপধাম, জেলা নদীয়া

অলমিতি
সাধুগুরুবৈষ্ণব
কৃপাপ্রার্থিণী
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

কে আমি

নব যোগীন্দ্র সংবাদ

লীলাশ্রী

অবধূত সংবাদ

রায় রামানন্দ মিলন

ভূমিকা

ত্রেতাযুগে মহারাজ নিমি বলেছেন—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনম্॥

ভাঃ ১১।২।২৯

মানুষ দেহ পাওয়া এক দুর্লভ বস্তু। কারণ বহু জন্ম পেরিয়ে জীবাত্মা একটি মনুষ্য দেহ পায়। শাস্ত্র বলেছেন—পশু পক্ষী, কৃমি, কীট, ডাঁশ, মশক, সরীসৃপ, স্থাবর জঙ্গম গুল্ম লতা এরকম কত দেহ তারপর কোন ভাগ্যগুণে ভগবানের কৃপার দান এই মানুষ দেহ জীবাত্মা পায়। মানুষ দেহটি কোন কর্মফলের পাওনা নয়—এটি ভগবানের কৃপার দান। কারণ মানুষ দেহ যদি কর্মফলের পাওনা হত তাহলে সেই দেহে ভজন করে কর্মফল খণ্ডনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত না। কর্মফলের পাওনা দেহ নিয়ে কর্মফল খণ্ডন করা যায় না। যেমন পাঁক দিয়ে পাঁক ধোওয়া যায় না। জল দিয়ে পাঁক ধুতে হবে। তেমনি ভগবানের কৃপার দান মানুষ দেহ বলেই এই দেহ দিয়ে কর্মফল খণ্ডনের ব্যবস্থা করা যায়। তাই মানুষ দেহ পাওয়ার পর আর একটুও দেরী করা চলবে না। তখুনি কাজে লাগাতে হবে। কারণ পরশমণি হাতে পাওয়ার পর লোহাতে ঠেকিয়ে সোনা করে নিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন দেরী করে না—তেমনি মানুষের বুদ্ধিমত্তা হল দেহটি মরণধর্মশীল এবং মিথ্যা অর্থাৎ দেহ হল ব্যাভিচারধর্মী বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়দশ্য, বৃদ্ধ অবস্থা—এই নানা অবস্থার বিপরিণাম। এর কোনটিই সত্য নয়। এই মর্ত্ত্য এবং মিথ্যা দেহ দিয়ে যদি সত্যস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ ভগবানকে রোজগার করে নিতে পারা যায় তাহলে তার মত বুদ্ধিমান আর কে আছে? একটি কানাকড়ি দিয়ে যে ব্যক্তি মোহর চিন্তামণি

রোজগার করে নিতে পারে তারই তো বুদ্ধিমত্তা। এইটি হল উপদেশসার বাণী। ভগবানকে পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতে হবে। কেন দেরী করলে ক্ষতি কি ? ক্ষতি আছে। কারণ দেহ হল অনিত্য। পরমকাল দেহকে আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন চাইবামাত্র ফিরিয়ে দেবার অঙ্গীকারে। চাইবামাত্র ফিরিয়ে দিতে হবে। একটুও দেরী করা চলবে না। কাজেই এ দেহের কোন স্থিরতা নেই। কুমারকাল অর্থাৎ পাঁচবছর বয়স থেকেই হরিভজন আরম্ভ করতে হবে বিষয়ভোগে মনোনিবেশ করলে আর হরিভজন হয় না।

চুরাশি লক্ষ দেহে যে কাজ হয়নি এই মনুষ্যদেহে সেই কাজ করতে হবে। এই মনুষ্যদেহের দ্বারা সাধনের বলে গৌর গোবিন্দ পাওয়া যায়। এই গৌরগোবিন্দ লাভই মনুষ্যদেহের বিচক্ষণতা। শাস্ত্র বড় রূঢ়। শাস্ত্রের খাঁটি চেহারা এইটাই। বিষয়ভোগ তো সব দেহেই আছে! কিন্তু গৌরগোবিন্দ পাওয়ার জন্য মনুষ্যদেহে বিচার করতে হবে। বিচার করা হলে মনকে বুঝতে হবে। জগতে কতরকমের বিচার আছে কিন্তু ভগবানকে পাওয়ার জন্য মনুষ্যদেহে বিচার করতে হবে। শাশ্বত সুখধামে কিন্তু একমাত্র মানুষই যেতে পারে। সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য কিন্তু আর কোন দেহের নেই। বিচার যদি কিছু করতে হয় তো এই বিচারই করতে হবে! মনকে না বুঝান পর্য্যন্ত কোন কাজ হবে না। পরিপূর্ণ বিষয়ভোগ করে তার অবসরে হরিনাম করলে তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। আমরা বিষয় ভোগ করে যখন উচ্ছিষ্ট দেহ নৈবেদ্য ভগবানকে নিবেদন করতে যাই তখন তিনি হাসেন। তিনি বলেন—অনাঘ্রাত পুষ্প, অনাস্বাদিত ফল গোবিন্দের ভোগে লাগে আর তুই উচ্ছিষ্ট দেহ দান করতে এসেছিস্ ? তবে ভগবান তো অত্যন্ত কৃপালু। তাই তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন না। বলেন,—শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর পুতনার দেওয়া বিষ যখন গ্রহণ করেছি তখন তো কাউকে

ফেরাতে পারি না। উচ্ছিষ্ট দেহ দিচ্ছিস্ তাই দে! প্রহ্লাদজী বললেন,—বিষয় ভোগের পর আর হরিভজন হয়ে উঠবে না। কারণ চুরাশি লক্ষ দেহের বিষয়ভোগের সংস্কার মানবদেহে আসে! কাজেই তার হাত এড়ান কিছুতেই যায় না। এ সংস্কার ছাড়া যায় না। মনুষ্য দেহের কাজ হল পুরাণো এই চুরাশি লক্ষ দেহের সংস্কার ভুলে নূতন সংস্কার গৌরগোবিন্দ বলা অভ্যাস করতে হবে। এইটিই মনুষ্যদেহের নূতন সংস্কার। এ সংস্কার তৈরী করতে একমাত্র মানুষই সক্ষম। তার জন্যই সাধু, গুরু, বৈষ্ণব শাস্ত্রের উপদেশ প্রয়োজন। মানুষ এই গৌরগোবিন্দ বলা রূপ সংস্কার নূতন করে করতে পারে বলে দেবতারা পর্য্যন্ত মানুষকে ভয় করেন। ধ্রুব পাঁচবছরের বালক। তার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অনেক চেষ্টা করেছেন, অপ্সরা পাঠিয়েছেন কিন্তু পরাজিত হয়েছেন। মানুষকে দেবতারাও ভয় করেন কারণ মায়ার কুহকে পড়ে সৃষ্টি যে ধারায় চলেছে তার ব্যতিক্রম একমাত্র মানুষই করতে পারে। জীবের অনাদি জন্মমরণের ক্লেশে মহামায়ার কিঙ্করত্ব এইটিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানুষই তার জীবনে মহৎকৃপার জোগাড় করে এই অনাদি জন্মমৃত্যুর হাত হতে রেহাই পেতে পারে। চুরাশি লক্ষ দেহের বিষয় ভোগের সংস্কার জীবকে নিরন্তর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ দেহ পাওয়ার পর ঐ সংস্কার ছাড়তে হবে। তবেই ভজনের সংস্কার গৌরগোবিন্দ বলার সংস্কার মানুষদেহে ফুটবে। মানবদেহ পাবার পরও পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার তাড়া দেয়। চুরাশি লক্ষ দেহের বিষয়ভোগের কুফল রস মানুষ-দেহে বসে গেলে আর হরিতে মন দিতে পারা যাবে না।

কেউ হাটে গিয়ে প্রধান খাদ্য যে চাল তাই না নিয়ে যদি অন্য সব কিনে বাড়ী ফেরে তাহলে যেমন তার হাট করাই বৃথা তেমনি এই মহামায়ার হাটে আমাদের বাজার করে ফিরতে হবে। সত্যিকার পেটভরাবার জিনিষ কিনতে হবে। সত্যিকার পেটভরাবার জিনিষ

হল একমাত্র হরিভজন। আচার্য্য শঙ্কর যিনি অদ্বৈত বেদান্তীর গুরু তিনিও বললেন—

হরিগুণকীর্ত্তনং হি আত্মনো ঘাসঃ।

শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলাই আত্মার খাদ্য। মহাজন পদকর্ত্তা বললেন—হরিনামামৃত খাইতে পাবে। এ জগতের প্রাকৃত খাদ্যে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় তা যতই সুন্দর যতই মূল্যবান হোক তাতে আত্মার পেট ভরে না। আত্মার পেটে এর একটা দানাও পড়ে না। কারণ আত্মা তো চিৎ বস্তু—সে এ জগতে মায়ার খাদ্য অচিৎ বস্তু নেবে কেন? মানুষ যেমন গরুর খাদ্য খায় না, আত্মাও তেমনি প্রাকৃত বস্তু খায় না। তাই হরিভজন করে আগে আত্মার পেট ভরিয়ে নিতে হবে—কারণ পেটে ক্ষুধা আর সামনে খাদ্য—কেউ হাতে তুলে খেতে দেরী করে কি? যে হাতে তুলে খায় না সে তো মহামূর্খ। তেমনি আত্মার অনাদিকালের ক্ষুধা আর সাধুগুরু-বৈষ্ণবের করুণায় ভগবানের নাম, রূপ, গুণ লীলা খাদ্য থরে থরে সাজানো আছে, খাদ্যের অভাব তো নেই—খাদ্য তো খেলে ফুরিয়ে যাবে না। এ জগতের খাদ্য ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ভগবানের নাম খাদ্য যতই গ্রহণ করা যাক্ ফুরিয়ে তো যাবে না। তাই বুদ্ধিমত্তা এইটিই, এই খাদ্য জীবনে যত গ্রহণ করে নিতে পারা যায়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হরিভজন করতে হবে। পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের বাণী—

যে ভিখারী ভিক্ষায় বের হয় সন্ধ্যাকালে
সে ভিখারীর কি ভিক্ষা মেলে?

সন্ধ্যাকালে ভিক্ষায় বের হলে ভিক্ষা মেলে না বটে, কিন্তু এ ধন্য কলিযুগ কিনা তাই এই পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারে সন্ধ্যাকালে ভিক্ষায় বের হলেও লাভ আছে। পতিত আমরা সবাই, কিন্তু বোধ নেই তাই পতিতপাবনের কৃপা হয় না। পতিত বলে যখনই বোধ হবে তখনই দয়া হবে। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের

শ্রীমুখের বাণী—

মুখে পতিত পতিত সবাই বলে
কুরঙ্গ মাতঙ্গে চলে—

পতিতকে উদ্ধার করেন বলেই তাঁর নাম পতিতপাবন। পতিত পাবনের দৃষ্টি থাকে নিচের দিকে। অভিমানের মাচায় বসে থাকলে তাঁর দৃষ্টি পড়ে না। তাই মহাজন বললেন—

পতিতপাবন নাম শুনেছ তাতে তোমার ভরসা কিসে?
তুমি যে ভাই অভিমানের মঞ্চোপরি আছ বসে॥

হরিভজন করবার উপদেশ শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে দিলেন। শাস্ত্র কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। প্রতারণার বাক্য বলেন না। জীবনের একটি নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই। নিঃশ্বাস তো বায়ু। বায়ুর স্বভাব চঞ্চল। চঞ্চল বালককে যেমন বিশ্বাস করে ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না তেমনি নিঃশ্বাস বায়ুর ওপর নির্ভর করে পরকাল নষ্ট করার কাজ করা ঠিক নয়। যতক্ষণ প্রাণ দেহে আছে ততক্ষণ গৌরগোবিন্দ বলতে হবে। অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহ পরমার্থের দাতা। অর্থদ অর্থাৎ অর্থের আগে একটি পরম শব্দ যোগ করে দিতে হবে। পরমায়ুর প্রতিটি অংশ পরমার্থের জন্য খরচ করতে হবে। শৌনক প্রভৃতি ঋষি সূতমুনিকে বলেছেন—'সূত, আমাদের কাছে এমন কথা বল, যাতে কৃষ্ণকথাই আছে, অন্য কথা নেই।' কারণ কৃষ্ণকথা না শুনে অন্য কথা শুনে যদি জীবন যায় তাহলে আয়ুর অসদ্ব্যয়ই হবে। তাই আয়ুর প্রতিটি অংশ শ্রীহরির কথায় খরচ হওয়া উচিত। পরমার্থ উপার্জ্জনেই এই দেহকে লাগান উচিত। সংসার অরণ্যে কামলোভের অগ্নি নিরন্তর জ্বলছে। এ দহনের বিরাম নেই। কিন্তু তার মধ্যে বাস করেও যাঁরা সন্তপ্ত হন না এমন ব্যক্তিও আছেন। সেইরকম ব্যক্তিরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১০৮ শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ যিনি সারাজীবনের প্রতিটি ক্ষণ রসময় গৌরকিশোরের রস আস্বাদনে ভরপুর করে রেখেছেন।

আজ থেকে পাঁচশত বছরের কিছু বেশী হল শ্রীধাম নবদ্বীপে এক যুগসন্ধিক্ষণে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব ঘটে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁর নদীয়া লীলার নাম এটি তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের আগে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষাদানের গুরু শ্রীকেশব ভারতীর দেওয়া নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কলিযুগে অবতীর্ণ, যে কলিযুগে আমরা জন্ম পেয়েছি। এই কলিকে ধন্য কলি বলা হয়েছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন—

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, শাস্ত্রীয় প্রমাণে ভাগবতীয় প্রমাণে। শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ গ্রন্থে প্রসঙ্গ আছে—কলিযুগে স্বয়ং ভগবানের আসবার কথা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের পরিভাষা বাক্য—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

সেই কৃষ্ণই গৌর হয়েছেন—

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞ্রু।।

আরও বলা আছে—

নন্দের নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।

যে দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ঠিক তার পরবর্ত্তি কলিযুগে অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগে গৌর আবির্ভাব। এটা কিন্তু শাস্ত্রীয় যুক্তিতে হয় না। কারণ বলা হয়েছে—

ব্রহ্মার একদিনে তিঁহ একবার।
অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার।।

ব্রহ্মার একদিন বলতে বুঝায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি—এই

চারটি যুগ যখন একবার ফিরে আসে তাকে বলে এক দিব্যযুগ। এই রকম একাত্তর দিব্যযুগ পার হলে তাকে বলে এক মন্বন্তর। এইরকম চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর। চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন আবার চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক রাত্রি। অর্থাৎ আঠাশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিবস ও একরাত্রি যা নিয়ে একটি দিন বলা হয়। তার মধ্যে স্বয়ং ভগবান একবার আসেন। তাই গৌরসুন্দর যে আবির্ভূত হয়েছেন এই কলিতে এটি কলিজীবের অচিন্তিত সৌভাগ্য। কলিতে ভগবান এসেছেন বটে তবে ঢাকা দিয়ে। তাই প্রচ্ছন্ন অবতার। প্রহ্লাদজী সত্যযুগে শ্রীশ্রীনরসিংহদেবের স্তুতি প্রসঙ্গে বললেন—

"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্—

দেবর্ষিপাদ নারদ কলিযুগে কলিজীবের দুরবস্থা দেখে আর্ত্তিভরে মিনতি জানিয়েছেন—"প্রভু একবার কলিযুগে চল"—তা না হলে জীবের দুর্গতি দূর হওয়ার কোন পথ নেই। প্রভু তো কিছুতেই রাজী নন। শাস্ত্রের নিষেধবাক্য—দেখালেন—বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর গ্রন্থ থেকে—'প্রত্যক্ষরূপধৃক দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।" কলিযুগে ভগবান হরি প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্য হবেন না। নারদ তো কৃষ্ণ ভজেন তাই বড় চতুর—ভগবানের চতুরতার উপরেও ভক্তের চতুরতা। তাই ভগবানের চতুরতার উপরেও চতুরতা দেখিয়ে নারদ বললেন—প্রভু প্রত্যক্ষরূপে নাই বা পেলে—প্রত্যক্ষরূপ তো তোমার দুটি, একটি হল শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আর একটি দ্বিভুজ মুরলীধর নবকিশোর নটবর, গোপবেশ বেণুকর। এই দুটি রূপের কোনটি নিও না। একটু ঢাকা দিয়ে চল। নারদের এই কথাটি প্রভুর বড় ভাল লেগেছে, বললেন—যাব নারদ কলিযুগে যাব তবে ঐ ঢাকা দিয়েই যাব। এই ঢাকাটি কি? কিসের আবরণ? শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বললেন—প্রেয়সীভাবাবৃতত্বাৎ। প্রেয়সী শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবকান্তির আবরণ। এই ঢাকা দিয়ে গৌর এসেছেন। তাই তাঁকে দেখলে ভগবান বলে বুঝা যায় না।

কোন ভগবান হাসে কাঁদে, নাচে গায় ? এমন কোন ভগবৎ স্বরূপ আছে ? ভগবানের লীলার অনেক ব্যতিক্রম তাই গৌরলীলায় দেখা যায়। ভগবান যখনই আসেন তখনই নিজে বক্তার আসনে বসেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বক্তা আর ভক্ত সখা অর্জ্জুন শ্রোতা বা প্রশ্নকর্ত্তা। এইভাবে অর্জ্জুন গীতার (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা) প্রকাশ। আবার শ্রীগোবিন্দজী—বক্তা হয়ে কথা বলছেন আর পরমপ্রিয় সখা শ্রীউদ্ধবজী শ্রোতার আসনে বসে একটির পর একটি প্রশ্ন তুলছেন, যার ফলে শ্রীগোবিন্দের কথা বলার সুবিধা হয়েছে। এই জন্যই শ্রীউদ্ধব গীতা প্রকাশ হলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের এ লীলায় এ চিত্রের ব্যতিক্রম হয়েছে। এখানে গোদাবরী তীরে যে চিত্র হয়েছে তাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর বসলেন শ্রোতা বা প্রশ্নকর্ত্তার আসনে এবং ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায়কে বসিয়েছেন বক্তার আসনে। গৌর ভগবান অশেষ বিশেষে রসভোক্তা—রসপেটুক হয়ে লোভাতুরের মত প্রশ্ন করছেন আর গৌরসুন্দরেরই কৃপাপৃষ্ঠ কণ্ঠে শ্রীপাদ রামানন্দ রায় তার জবাব দিচ্ছেন—এ বড় বিচিত্র লীলা তাই বুঝে উঠতে পারা যায় না। পরম রসিক রসিকশেখর রসিককেন্দ্র চুড়ামণি আজ রসের সন্ধানে রসসাগরে ডুবে গেছেন। আত্মহারা হয়ে রামানন্দের কাছে বিনীত প্রার্থনা করছেন—বল বল রামানন্দ এর পর কি ? এর পর কি ? কাজেই গৌর দেখলে বুঝবার উপায় নেই—যে তিনি ভগবান।

আমরা কলিজীব একান্ত দুর্গত, অসহায়। আমাদের হৃদয় কামক্রোধলোভমোহ নানা কুটিলতায় ভরা। কিন্তু গৌরসুন্দর করুণাবারিধি। তাই কলিজীবের প্রতি অশেষ করুণায় আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরই পাঁচ শত বছর পূর্ত্তি শুভ জন্মোৎসব হয়েছেন আমাদের ভাগ্যের সীমা নেই। গৌর ভালবাসার কথা কিন্তু আমি ভালবাসতে পারি নি। কারণ এ জগতে মানুষ যে এতটুকু উপকার করে তার প্রতি কতভাবে কৃতজ্ঞতা জানায়, আর যিনি নিজের জীবন দিয়ে

বিশ্ব জগৎকে অনাদিকালের দুর্ব্বাসনা অজ্ঞতা পাপের পঙ্ক থেকে তুলে ভগবানের শ্রীচরণে উন্মুখতা দান করলেন তাঁর প্রতি সামান্য একটু কৃতজ্ঞতাও আমাদের নেই। আজ যে কোন সম্প্রদায় যে কোন নামই করুন কালী দুর্গা শিব, গণেশ সবই শ্রীগৌর সুন্দরের করুণার দান। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে তাই বললেন—

"যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালু—

রুল্লাঙ্ঘয়নপাকরোৎ প্রমত্তম্—"

মানুষ যে অজ্ঞানতায় মত্ত ছিল গৌর ভগবান তাদের সেই অজ্ঞানতা রূপ মত্ততা দূর করে স্বপ্রেমসুধা পান করিয়ে প্রেমে প্রমত্ত করলেন। এর চেয়ে দয়া আর হয় না। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান, দরিদ্রকে ধনদান যত রকমের দয়াই জগতে থাকুক কিন্তু জীবের প্রতি সবচেয়ে বড় দয়া হল ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখ জীবকে যদি উন্মুখতা দান করা যায়। ভগবানকে ভুলে জীবের যে দুর্গতি সেই দুর্গতি দূর হবে যদি তাকে ভগবানের কথা মনে করিয়ে দিতে পারা যায়। ভগবানে অরুচি যাদের তাদের যদি রুচি দান করা যায়—এর মত দয়া আর হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার সেই দয়া করেছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

তাই প্রথমেই নিবেদন করে রাখি—আমি গৌর ভালবাসতে পারিনি—একথা খাঁটি সত্য কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য যিনি গৌর ভালবেসেছেন—গৌরকে যিনি জীবন সর্ব্বস্ব করেছেন, গৌর ছাড়া যিনি কিছু জানেন না, মহাজনের পদে ধরা আছে—

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর

গৌর নয়ন তারা।

জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হারা ॥
গৌর বিহনে না বাঁচি পরাণে
গৌর করিলাম সার ।
গৌর বলিতে জনম যাউক
কিছু না চাহিয়ে আর ॥

এই পদের স্রষ্টা মহাজন (শ্রীল নরহরি দাস)। পদের ভাবার্থ মূর্ত্তি ধারণ করে প্রকাশ পেয়েছেন, তিনি হলেন আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজ—অনন্তশ্রী শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ। তিনি তাঁর আস্বাদনে ভরপুর হয়ে আছেন। অগাধ গৌররসে ডগমগ। আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি কীটানুকীটের পক্ষে তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করা অনুভব দিয়ে স্পর্শ করা একেবারেই অসম্ভব। তবু তাঁরই কৃপায় তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য তো হয়েছে। যেমন সূর্য্যের আলোতেই সূর্য্য দেখা সম্ভব হয়, অন্য কোন আলোতে হয় না, তবে দেখেছি এটি হয়ত মনের জোরে বলি—কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে দর্শনও হয় নি কারণ সে নয়ন কোথায় ? তবু বামনের চাঁদে হাত দেবার লোভের মত তাঁর একান্ত কৃপাকে সম্বল করেই এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়াস। গৌরসুন্দরের ভগবত্তা, তত্ত্ব, রস, প্রেম, লীলা-মাধুরী প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয় কারণ সুধী ভক্তগণ গৌর-রসামোদী, সে রসে ডগমগ হয়ে আছেন—এখানে শুধু এইটুকুই তুলে ধরার প্রয়াস, আমার শ্রীগুরু মহারাজ কেমন করে গৌর সর্ব্বস্ব করেছেন—জীবনে কেমন করে তাঁকে ভালবেসেছেন। কেমন করে গৌর ভোগ করেছেন। সুধী গৌর প্রিয়ভক্তগণের শ্রীচরণে শতকোটি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে এইটিই একান্ত প্রার্থনা—তাঁরা আমার সকল ত্রুটি মার্জনা করে ক্ষমা সুন্দর চক্ষে আমার জন্য শ্রীগৌর গোবিন্দ শ্রীচরণে এইটিই প্রার্থনা জানাবেন যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীগুরু নিতাই, শ্রীগুরুগৌর বলে মরতে পারি।

গৌর পরতত্ত্বসীমা

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেছেন—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই পরতত্ত্বসীমা। কৃষ্ণমন্ত্রে গৌর আরাধনা হবে না। গৌর আরাধনার পৃথক্ মন্ত্র, পৃথক্ পদ্ধতি চাই। কারণ গৌরসুন্দরের ধাম, লীলা পরিকর সম্বন্ধে শাস্ত্রে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ আছে। তাই তাঁর উপাসনা পদ্ধতি পৃথক্ হবে এটি শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু যে ভগবৎ স্বরূপের যেমন কৃষ্ণভগবানের যোগিনী স্বরূপের পৃথক্ ধাম, পরিকর লীলার উল্লেখ শাস্ত্রে নেই তাই কৃষ্ণ মন্ত্রেই যোগিনী কৃষ্ণের উপাসনা হবে। তার জন্য পৃথক্ উপাসনা পদ্ধতির দরকার হবে না। কারণ শ্রীগৌরসুন্দর নিজে প্রকট লীলায় কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের কাছে নিজের শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদি এটি শাস্ত্রসিদ্ধ না হত তাহলে গৌর নিজে এটি করতেন না। কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়ে তারই সেবাপূজার বিধান করতেন। কালনার গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আদর্শ ধরে পরবর্ত্তীকালে গৌরবিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অদ্বৈতবেদান্তী উপনিষদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেন তিনি যাঁর অঙ্গজ্যোতি, তিনি সকলের ভিতরে অন্তর্য্যামিরূপে থাকেন যাঁকে পরমাত্মা বলা হয় তিনি যাঁর অংশ আর ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ লীলাময় শ্রীবিগ্রহ যে ভগবান অনন্তলীলাময়—সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। ইনিই পরতত্ত্বসীমা।

শ্রীল কবিরাজ বললেন—'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।' চৈতন্যস্বরূপকে পরতত্ত্বসীমা বলে নির্দ্দেশ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যে পরতত্ত্ব এটি তো শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ ও সম্মত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে বললেন—আমার উপর অন্য কোন তত্ত্ব আছে বলে মনে রাখবে না হে অর্জ্জুন আমিই পরতত্ত্বসীমা।

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' গীতা ৭।৭

শ্রীল কবিরাজ কি তারই পুনরাবৃত্তি করলেন? না, তা করেন নি। যদি তা করতেন তাহলে অপূর্ব্বতা থাকত না এবং অপূর্ব্বতা না থাকলে শাস্ত্র হত না। তাই শ্রীল কবিরাজ শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন না ক'রে পূর্ব্বতা খণ্ডন না ক'রে অপূর্ব্বতা স্থাপন করলেন। সেই কৃষ্ণই চৈতন্যস্বরূপে আবির্ভূত। কৃষ্ণ তো পরতত্ত্ব আছেনই কিন্তু চৈতন্যস্বরূপকে যদি সেই পরতত্ত্বই বলা যায় তাহলে তো অপূর্ব্বতা হল না। চৈতন্যস্বরূপে এই পরতত্ত্বের আধিক্য আছে। তাই সেখানে অপূর্ব্বতা বজায় রইল। তখন কবিরাজের বাক্য সার্থক হল এবং শাস্ত্র হ'ল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গৌরস্বরূপে পরতত্ত্বের আধিক্য কোথায়? স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র স্বরূপে তো পূর্ণ। যেমন পূর্ণচন্দ্রের নিজস্ব শোভা তো আছেই কিন্তু তারকা বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের শোভা আরও বেশী। তেমনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ স্বরূপে পূর্ণ—নিজের প্রভাবে নিজেই দীপ্তিশালী কিন্তু সেই পূর্ণস্বরূপ যদি তাঁর পার্ষদে পরিপূর্ণ হন তাহলে তাঁর শোভা বেশী বাড়ে। যেমন সাগর তো স্বভাবতই পূর্ণ কিন্তু তরঙ্গসংকুল সাগরের শোভা সমধিক। ভগবানও তেমনি নিজস্বরূপমাধুর্য্যে পূর্ণ কিন্তু বিলাসময় তরঙ্গসদৃশ পার্ষদগণের লীলাবিলাসে যখন ভগবান মণ্ডিত হন তখন তাঁর শোভা আরও বেশী। ভগবানের পার্ষদ তাঁর স্বরূপশক্তির বিলাস। তাই পার্ষদশোভিত ভগবানের স্বরূপ হল

তাঁর বিলাস স্বরূপশক্তি সমন্বিত অবস্থা। এতে ভগবানের শোভা বেশী হয়। এই স্বরূপশক্তির মাঝে যখন ভগবান তখন তাঁকে লক্ষ্য করেই শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ বললেন—

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

ভাঃ ১০।৩৩।৬

নীলকান্তমণি যদি পদ্মরাগমণিবেষ্টিত হয় তাহলে তার শোভা বাড়ে। সে শোভার তুলনা হয় না। এখানে শ্রীশুকদেবের বলবার অভিপ্রায় হল হ্লাদিনীশক্তিমণ্ডিত রসরাজ শ্রীগোবিন্দস্বরূপ—এই স্বরূপের শোভায় স্বরূপের পূর্ণতা। শ্রীল কবিরাজের বাক্যের তাৎপর্য্য যদি এই ভগবৎস্বরূপ হত তাহলেও অপূর্ব্বতা হত না। হ্লাদিনী শক্তি গোপীর মাঝে রসরাজ শ্রীগোবিন্দ শক্তিমণ্ডিত হয়েও যেন অমণ্ডিতবৎ অর্থাৎ মণ্ডিত যেন নন। কারণ সেখানে শক্তি ভগবৎস্বরূপ থেকে আলাদা হয়ে আছে। অবশ্য স্বরূপে তো শক্তি আছেই কিন্তু তা সুপ্তবৎ। বাইরে গোপীরূপে যে শক্তির প্রকাশ তার সঙ্গে ভগবানের মাখামাখি নেই। সে শক্তিকে ভগবান গায়ে মাখেন নি। গৌরস্বরূপে কিন্তু সেই শক্তিকে গায়ে মেখে এসে এসেছেন। তাই গৌর স্বরূপের প্রণাম মন্ত্রে মহাজন বললেন —'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।' এখানে হ্লাদিনী শক্তির পরকাষ্ঠা মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর ভাব কান্তিকে গায়ে মেখে ওতপ্রোতভাবে গায়ে জড়িয়ে এসেছেন। এখানেই গৌরের অপূর্ব্বতাটি ফুটেছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের এই গৌরতত্ত্বটি শ্রীল বাবাজী মহারাজ মনে প্রাণে গ্রহণ ক'রে কীর্ত্তনের মাধ্যমে অক্ষরসুধাধারা বর্ষণ করলেন—

প্রভাতে স্মরণকীর্ত্তনে বললেন—

মহাভাব প্রেমরসে —জয় শচীনন্দন
রাধাভাবদ্যুতি চোরা —জয় শচীনন্দন

কিশোরীবরণ ধরা —জয় শচীনন্দন
রাই অনুরাগে তনু গড়া —জয় শচীনন্দন
পিরীতি মূরতি গোরা —জয় শচীনন্দন
মহাভাবপ্রেমরসখনি —জয় শচীনন্দন
বদনে মদন বেটে মাখান —জয় শচীনন্দন
তাহে লাবণ্যামৃত সিঞ্চন —জয় শচীনন্দন
অঙ্গে ভাবাবলী ভূষণ —জয় শচীনন্দন
ভাবভরে দোলন —জয় শচীনন্দন

প্রভাতী কীর্ত্তনে অক্ষর দিলেন—

সর্ব্বতত্ত্বের অবধি গৌর আমার
মহাভাব প্রেমরস বারিধি গৌর
মহাভাবে বিভাবিত নিরবধি গৌর আমার
রসময় প্রাণগৌর
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর
রাধাভাবে সদাই বিভোর
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-আকৃতি গৌর আমার
যুগল উজ্জ্বল রস নির্য্যাস মূরতি গৌর আমার
মহাভাব প্রেমরস ঘনাকৃতি গৌর আমার
রাইকানু একাকৃতি
স্বর্ণ পঞ্চালিকা ঢাকা নীলমণি
মূরতি অদ্ভূত
ভানুসুতামণ্ডিত নন্দসুত

গৌরস্বরূপে আরও অপূর্ব্বতা শ্রীল কবিরাজ দেখিয়েছেন—স্বয়ং ভগবান্ রসরাজ শ্রীগোবিন্দ রসস্বরূপ চরম আস্বাদ্য। কিন্তু রস তো একা থাকলে হবে না। আস্বাদ্য একা থাকলে হবে না পাশে আস্বাদক চাই। রসের মর্য্যদা হবে রসতৃষ্ণার আস্বাদনে। তৃষ্ণার তীব্রতাতেই জল সুপেয় হয়। জল প'ড়ে থাকলেও লাভ

নেই যদি তাকে গ্রহণ করবার জন্য পিপাসা না থাকে। তেমনি রস রসতৃষ্ণার দ্বারা গ্রহণের অভাবে মর্য্যাদাহীন হয়। এই রসতৃষ্ণারই অপর নাম ভক্তি। এই রসতৃষ্ণার চরম অবস্থা রাধাপ্রেম। রসের দিক দিয়ে যেমন রসরাজ শ্রীগোবিন্দের উপরে আর কেউ নেই তেমনি রসতৃষ্ণার সম্বন্ধেও এই বাক্যই প্রযোজ্য হবে যে রাধারাণীর উপরে আর কেউ নেই। এই রসতৃষ্ণা নিয়ে রাধারাণী দাঁড়িয়েছেন। তৃষ্ণা নিয়ে রাধারাণী দাঁড়িয়েছেন এটি বলবার জন্য বলা হল মাত্র তা না হলে এইটিই বলা ঠিক হবে যে রসতৃষ্ণাই একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে—সেইরূপটিই হল রাধাস্বরূপ। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রই তো গৌর অর্থাৎ রসতৃষ্ণা সহ রসের মূর্ত্তি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাধক জগৎ এই গৌরস্বরূপের কাছে কি পায়? এ জগতে অনেক জায়গায় শুধু খাদ্য আছে ক্ষুধা নেই, অনেক জায়গায় আবার ক্ষুধা আছে, খাদ্য নেই, কিন্তু ক্ষুধা সমেত খাদ্য যদি কেউ দিতে পারে তাহলে তার দানই সুন্দর। আমরা অনন্ত খাদ্য চাই কিন্তু অনন্ত ক্ষুধা যদি না থাকে তাহলে অনন্ত খাদ্য পেয়েও লাভ নেই। অনন্ত ক্ষুধাসমেত অনন্ত খাদ্য পেলে তবে তৃপ্তি। সসীম ক্ষুধা ও সসীম খাদ্য দুইই অতৃপ্তি দায়ক।

আজ গৌরস্বরূপে ক্ষুধা এবং খাদ্যের একত্র মিলন হয়েছে। রসতৃষ্ণার সঙ্গে রসের মিলন হয়েছে। তাই সাধক জগৎকে গৌর ক্ষুধা এবং খাদ্য একসঙ্গে দিয়েছেন, রসতৃষ্ণার সঙ্গে রস দান করেছেন। গৌরস্বরূপে আস্বাদ্য ও আস্বাদকের, রসের ও তৃষ্ণার একত্র মিলন হয়েছে। তাই গৌর আরাধনায় রসলিপ্সু সাধকের পরিশ্রমের মাত্রা কমে গেছে। অন্য ভগবৎস্বরূপের আরাধনায় রসতৃষ্ণা অর্থাৎ ক্ষুধা তৈরী করতে হয়। তাতে অনেক পরিশ্রম। কিন্তু গৌর আরাধনায় আর তৃষ্ণা অন্বেষণের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না। এখানে রস এবং তৃষ্ণা সাধক একত্র পায়। এ দিক দিয়েও গৌরস্বরূপের অপূর্ব্বতা। শ্রীল বাবাজী মহারাজ এটি চরম

পরমভাবে আস্বাদন করে বললেন—

গৌর হোক্ সবার নয়ন তারা
নিশিদিশি বহুক ধারা
জগবাসী নরনারী সবাই হৃদে ধরুক আর গুণে ঝুরুক।
ভোগবাসনা পাসরুক—হৃদে ধরুক আর গুণে ঝুরুক।

প্রেমের রমণী ব্রজের যিনি মধুমতী তিনিই গৌর পরিকর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর—তাঁর শ্রীচরণে বাবাজী মহারাজ প্রার্থনা জানাচ্ছেন জগজীবের আরাধনার আনুকূল্যের জন্য—

লয়ে এস প্রেমের গাগরী
গৌর প্রেমের হাট বসায়ে
তেমনি করে আবার মাতাও
পিয়াও সবে ধরি ধরি
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমমধু
প্রেমে মাতুক নরনারী
মুখে ব'লে গৌরহরি

গোদাবরী তীরে শ্রীপাদ রামানন্দ রায় যা ভোগ করেছিলেন সেই নিগম নিগূঢ় গৌররহস্য প্রতি জীবে ভোগ করবার জন্য শ্রীপাদ প্রাণের নিবেদন জানাচ্ছেন—

প্রতি জীবে ভোগ করাও
সেই মুরতি একবার দেখাও
মহাভাব রসরাজ রাইকানু একত্র মিলন
করজোড়ে রামরায় বলে—
গোদাবরীতীরে প্রাণগৌর দেখে
একি দেখি অপরূপ
তোমায় প্রথমে দেখিলাম সন্ন্যাসীরূপ
তারপর দেখিলাম শ্যাম গোপরূপ
তার আগে দেখি স্বর্ণ পঞ্চালিকা

তার কান্তিতে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা

আমি তোমায় চিনেছি হে

তখন দেখায় গোরা রসভূপ

রাই কানু একাকৃতি

কিন্তু বিপরীতভাবে অবস্থিতি

এই মূরতি প্রতিটি জীব আস্বাদন করুক সেজন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রাণের আকুতি জানিয়েছেন।

গৌর স্বরূপে তিন বাসনা পূরণ

রসরাজ্যেও গৌরের অপূর্ব্বতা আছে—রসস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু নিজ মাধুর্য্য তিনি কখনও আস্বাদন করেন নি। ভক্ত সাধুই তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন করে। এখন ভক্তের ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনের আনন্দের মাত্রার আধিক্য দেখে ভগবানের সে আস্বাদনের জন্য লোভ জেগেছে—রসস্বরূপের আজ রসতৃষ্ণা জেগেছে। এইটিই গৌরস্বরূপের আকর বা বীজ। কৃষ্ণচন্দ্র আত্মারাম পূর্ণকাম। তাঁর স্বরূপানন্দ ভোগ তো তাঁর আছেই কিন্তু ভক্তের প্রেমানন্দ দেখে সেটি ভোগের জন্য রসরাজের বাসনা জেগেছে। স্বরূপানন্দের আনন্দ কৃষ্ণের কেমন সে সম্বন্ধে মহাজন বললেন—

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়।

রসরাজের শক্তিই রসতৃষ্ণা। কৃষ্ণ যে স্বরূপানন্দ ভোগ করেন তার একটা আনন্দ আছে বটে কিন্তু তাতে আতিশয্য নেই কারণ সেখানে নিজের ইন্দ্রিয়ই আনন্দ ভোগ করছে তাতে আনন্দের মাত্রা কম। কৃষ্ণ আজ তাই অপরের ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই মাধুর্য্যরাশি ভোগ করতে চান। রাধারাণী যেমন করে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন তেমনটি করে তো কৃষ্ণ আস্বাদন করতে পারছেন না। এতএব শ্রীগোবিন্দের লোভ জেগেছে এইখানে। রাধার আস্বাদনে গোবিন্দের লোভ এই লোভের মূলে বাসনার জন্ম। এই বাসনার খবরই শ্রীল স্বরূপ দামোদরজী তাঁর কড়চায় দিলেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

গোবিন্দ স্বরূপে এই তিনটি বাসনার জন্মভূমি হলেন ব্রজের

রাসস্থলী। রাসরসে খেলতে খেলতে হইল ইচ্ছার উদ্গম। রাস-রজনীতে শ্রীমতী রাধারাণী এবং অন্যান্য গোপরামার সঙ্গে আনন্দ-বিহারের পরে গোবিন্দ রাধারাণীর শ্রীমুখের দিকে চেয়ে দেখলেন যে সেখানে ভারী উল্লাস। রাধারাণীর মুখখানি আনন্দে ঝলমল করছে। এ আনন্দ হল কৃষ্ণভালবাসার আনন্দ। কৃষ্ণের রাধারাণীকে ভালবাসার আনন্দ জানা আছে কিন্তু রাধারাণীর কৃষ্ণভালবাসার আনন্দ জানা নেই। তবে রাধারাণীর আনন্দের উচ্ছলন দেখে গোবিন্দ অনুভব করতে পারেন নি তবে অনুমান করেছেন যে রাধারাণীর আনন্দের মাত্রা বেশী। এই বেশী মাত্রায় লোভ জেগেছে তাই প্রথম বাসনা।

প্রথম বাসনা ঃ শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন? রসরাজের আজ রসতৃষ্ণা। রাধার প্রেম প্রণয় অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণ বিষয়ক প্রীতি। কৃষ্ণের কাছে যে আনন্দের অনুভূতি আছে সেটি হল রাধাবিষয়ক প্রেমভোগের আনন্দ কিন্তু রাধারাণীর স্বরূপে আছে কৃষ্ণভোগের আনন্দ। এটি রাধাতেই আছে। কৃষ্ণস্বরূপে নেই। কিন্তু রাধারাণীর কৃষ্ণভোগের আনন্দের মাত্রা বেশী—এটি গোবিন্দ অনুমান করেছেন—তাই সেই আনন্দ পাওয়ার জন্য কৃষ্ণের লোভ জেগেছে।

দ্বিতীয় বাসনা ঃ অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জলের অতিশয় আস্বাদ পায় তেমনি রাধারাণী অতিশয় রসতৃষ্ণায় কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন। রাধারাণী অতিশয় তৃষ্ণায় যে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন, কৃষ্ণচন্দ্র ভাবছেন—আমার সে মাধুরী কেমন?

কৃষ্ণ স্বরূপে মাধুরী অনন্ত—অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী—যাঁর সমান বা বেশী মাধুরী কোথাও নেই—বলা আছে সে মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে। কিন্তু মাধুরী তো আস্বাদন করে প্রেম। সে প্রেম তো গোবিন্দে নেই। তাই এই দ্বিতীয় বাসনা—রাধারাণীর মত করে নিজ মাধুরী আস্বাদন করতে চেয়েছেন। এই আস্বাদনের বাসনার খবর শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বললেন—অপরি-

কলিত পূর্ব্বশ্চমৎ কারকারী স্ফুরতি মম গরীয়ান্ এষ মাধুর্য্যপূরঃ অয়ম্—।

তৃতীয় বাসনাঃ কৃষ্ণ ভাবছেন আমাকে প্রীতি করে রাধার কি জাতীয় সুখ?

শ্রীগোবিন্দ স্বরূপে কোনও অপূর্ণতা তো নেই—তাই বাসনা জাগাতে পারে না। কারণ বাসনার মূলে থাকে অভাব। অভাব না হলে লোভ জাগে না। কিন্তু গোবিন্দের এই তিনটি বাসনা—রসময় বাসনা—প্রেমগত বাসনা—তত্ত্বগত বাসনা নয়—কারণ গোবিন্দ স্বরূপে তত্ত্বগত কোন অপূর্ণতা নেই—তিনি পূর্ণ পূর্ণতম ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। কিন্তু রসে তিনি অপূর্ণ—যদিও কৃষ্ণ রসরাজ তবু তাঁর স্বরূপে রসের অপূর্ণতা—কারণ এটি রসরাজ্যের স্বভাব। রস অর্থাৎ প্রেম কখনও পূর্ণ হতে জানে না—রস সর্ব্বদা অপূর্ণ—এইটিই রসের মর্য্যাদা। তাই এই তিন বাঞ্ছা আশ্রয়তত্ত্বগত—এটি বিষয়তত্ত্বে আসে না। আজ আশ্রয়জাতীয় বাসনাতে বিষয়তত্ত্বের লোভ হয়েছে। তিনটি বাসনাই ভাবগত, রসগত, প্রেমগত—সুতরাং এ লোভ জাগতে পারে। কড়চায় তাই বললেন 'লোভাৎ'। গোবিন্দ তো সর্ব্ব-সামর্থ্যবান সর্ব্বশক্তিমান। বাসনা যদি জেগেই থাকে পূরণ করে নিতে কতক্ষণ? এ তো জীবের বাসনা নয় যে সামর্থ্যের অভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু মজা এমনই শ্রীগোবিন্দের পক্ষেও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না—কারণ আশ্রয়বিষয়জাতির বাধা। আশ্রয়-জাতীয় সুখাস্বাদন বিষয়-জাতির পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। যেমন এ জগতে বাৎসল্য-প্রীতির আশ্রয়জাতি পিতামাতার অন্তরের দরদ বা উদ্বেগ বিষয়জাতি সন্তান পুত্র বা কন্যার পক্ষে জানা কিছুতে সম্ভব হয় না। সে সন্তান জ্ঞানে গুণে যতই বড় হোক্।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আশ্রয়জাতি ও বিষয়জাতি বলতে কি বুঝায়? রস দ্বিনিষ্ঠ। অর্থাৎ দুটিকে অবলম্বন করে রসের স্থিতি বা রসের আস্বাদন। যেমন পক্ষী দুটি ডানার উপর ভর করে চলে। একটি

ডানা কেটে দিলে সে যেমন আর উড়তে পারে না—তেমনি রসপক্ষীর দুটি ডানা—একটির নাম আশ্রয়জাতি অপরটির নাম বিষয়জাতি। রস যেখানে তৈরী হয় তাকে বলে, রসের আশ্রয়জাতি আর তৈরী হয়ে যেখানে যায় অর্থাৎ যে ভোগ করে তাকে বলে বিষয়জাতি। যেমন প্রাকৃত জগতে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় বাৎসল্য প্রীতি—কারণ এ জগতে তো রস বলে কোন বস্তু নেই এ জগতে রস হয় না কারণ রসের স্থান তত্ত্বের ওপরে এ জগতে তত্ত্ব নেই—তাই রস হয় নানা প্রীতি ভালবাসা এ পর্য্যন্ত বলা যায়। সেই বাৎসল্য প্রীতি তৈরী হয় পিতামাতার হৃদয়ে—তাই পিতামাতা হলেন বাৎসল্য প্রীতির আশ্রয়জাতি আর সেই প্রীতি পুত্র বা কন্যা ভোগ করে। সুতরাং সন্তান হল বাৎসল্য প্রীতির বিষয়জাতি। এখানে পিতামাতার অন্তরের দরদ বা উদ্বেগ সন্তান সে জ্ঞানে গুণে যতই বড় হোক্ তবু তার পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ বিজাতীয় আস্বাদন এখানে রস নয়, রসের আভাষ তাও সম্ভব হচ্ছে না। সন্তান যদি কোনদিন নিজে পিতামাতা হতে পারে তবে তার পক্ষে পিতামাতার অন্তরের দরদ বা উদ্বেগ জানা সম্ভব। অর্থাৎ বিষয় জাতি যদি কোনদিন নিজে আশ্রয়জাতি হতে পারে তাহলে তার পক্ষে আশ্রয়জাতির আস্বাদন পাওয়া সম্ভব—নতুবা নয়। এখানেও সেই একই নিয়ম। রাধাগোবিন্দের লীলা মধুর রসের লীলা এই মধুর রস তৈরী হচ্ছে রাধারাণীর হৃদয়ে আর যাচ্ছে শ্রীগোবিন্দে। তাই মধুর রসের আশ্রয়-জাতি শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী প্রীতি ঠাকুরাণী আর বিষয়জাতি হলেন শ্রীগোবিন্দ নিজে। গোবিন্দ সকল রসেরই বিষয়জাতি, মধুর রসের তো বটেই। সুতরাং গোবিন্দ অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক ভেবেছেন কিন্তু দেখলেন আমা হতে হবে না। আমি তো রসের বিষয়জাতি তাই আশ্রয়জাতীর সুখাস্বাদন আমা হতে হবে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

"তখন ভাবিয়া দেখিলা মনে শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।
তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করল উদয়॥

শ্রীল বাবাজী মহারাজ গৌররসে ডগমগ হয়ে এই তত্ত্বটি কীর্ত্তনের মাধ্যমে তাঁর আঁখর সুধায় নিজে আস্বাদন করে জগজীবের জন্য করুণা করে প্রকাশ করেছেন। তা না—হলে শাস্ত্রের এই মর্ম্মকথা ক'জনেই বা বুঝত। প্রভাতী কীর্ত্তনে গাইছেন—

হইল ইচ্ছার উদ্গম
রাসরসে খেলতে খেলতে
শ্রীরাধিকার প্রেম মাধুর্য্যাধিক্য দেখে
বলে কে আমায় মুগ্ধ করে
আমি তো ভুবনমোহন
আমি উহার আস্বাদিব
শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন
সে প্রেমের মাধুরী কেমন
সেই প্রেমে কি বা সুখ
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ
কি করিবে না পাইয়া ওর।
কতই না চেষ্টা করলাম
কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম
আমা হতে হবে না
আশ্রয়জাতীয় সুখাস্বাদন ,,
আমায় বিভাবিত হতে হবে
আশ্রয়জাতীয় ভাবে ,,
মহাভাব স্বরূপিণীর ভাবে ,,

তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করল উদয় রে।
সাধিল মনের সাধা ঘুচিল সকল বাধা
ঘরে ঘরে বিলাল প্রেমধন রে॥

শ্রীপাদ কলিজীবের দুঃখে দুঃখী হয়ে করুণাবিগলিত হয়ে গাইছেন—

তোদের ভাগ্যের সীমা নাই
ও কলিহত জীব
এসেছে রে তোদের তরে
গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে
রাধাভাবকান্তি লয়ে—গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে
এসেছে রে তোদের তরে
আসি নদীয়াতে করল উদয়॥

মহাজন গৌর স্বরূপ সম্বন্ধে বললেন—রাধাভাব দ্যুতিসুবলিত শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—রাধাভাবদ্যুতিচোরা। এখানে সুবলিত পদের তাৎপর্য্য হল ভাল করে পরখ করলেও যেন আমার (গোবিন্দের) ভাব বুঝতে না পারে। তত্ত্বে, ভাবে, অঙ্গকান্তিকে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে সবটাকেই আজ আশ্রয়তত্ত্ব বিষয়তত্ত্বকে কবলিত করেছে। তাই যে যাকে কবলিত করে তারই প্রাধান্য। গৌরস্বরূপে তাই আশ্রয়তত্ত্বের (রাধারাণীরই) প্রাধান্য। রসরাজ এখানে মহাভাবের দ্বারা কবলিত। কৃষ্ণচন্দ্রের কাল অঙ্গ কালিয়া বরণ চিরশাশ্বত প্রসিদ্ধ। মহাজন পদকর্ত্তা বললেন—

কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।

সে কৃষ্ণ অঙ্গকান্তি আজ রাধারাণীর অঙ্গকান্তিতে কবলিত হয়ে কাল রং ঢেকে গৌর হয়েছে। তাই মহাজন বললেন—

তার রং ফিরেছে ঢং ফিরেছে
কাল এখন চেনা দায়।

কৃষ্ণভাবও রাধাভাবের দ্বারা কবলিত হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব তাই আজ কৃষ্ণের হয়েছে। রাধার ভাব এবং কান্তিতে কবলিত যে কৃষ্ণচন্দ্র তিনিই তো রসময় গৌরকিশোর। শ্রীনামের রহস্য সূচক কীর্ত্তনে শ্রীপাদ অক্ষর দিলেন—

আবির্ভাব এক নব মূরতি
নবগৌর বর্ণ ঘন
মাখামাখি পুরুষ প্রকৃতি
কিশোরী বরণ কিশোর গঠন
রাইএর বরণ শ্যামের গঠন
রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি আকৃতি
যুগল উজ্জ্বল রস নির্য্যাস
আবির্ভাব এক সোনার মূরতি
সে যে আমার গৌরমূরতি
মহারাস বিলাসের পরিণতি
রসবতী ঢাকা রসভূপতি
দেখে প্রাণের গৌরহরি
রাইসম্পুটে বংশীধারী
দেখে প্রাণের শচীসুত
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য
দেখে মধুর গৌরদেহ
নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ

তাহলে গৌরস্বরূপে এদিক দিয়ে আর একটি অপূর্ব্বতা পাওয়া গেল—এটি হল রসানুভূতির অপূর্ব্বতা।

সাধকের পক্ষেও অপূর্ব্বতা হয়েছে। গৌরস্বরূপে তারা একত্রে রস ও রসতৃষ্ণার সন্ধান পেয়েছে। যে সন্ধান অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপের আরাধনায় মেলে নি।

এতগুলি অপূর্ব্বতার সন্ধান দিয়ে তবে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি

পাদ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করলেন—'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের এই পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকে শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রাণসর্বস্ব করেছেন। এমন আস্বাদন অন্য কোন স্বরূপে আছে বলে তো মনে হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম॥

গৌর আবির্ভাবের কারণ

রস আস্বাদন

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শুভ আবির্ভাবের দুটি দিক—দুটি কারণকে যথাক্রমে অন্তরঙ্গ বা মুখ্য এবং বহিরঙ্গ বা গৌণ-কারণরূপে উল্লেখ করা আছে। মুখ্য গৌণ বিচারের এইটিই ধারা—যে কাজের জন্য ভগবানের আসা সেটি মুখ্য বা অন্তরঙ্গ আর যে কাজ করতে এসে অন্য কাজটি অনায়াসে হয়ে গেছে সেটিই গৌণ বা বহিরঙ্গ। স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ রসরাজের রসিকশেখরতায় রসাস্বাদনের লোভ যার থেকে তিনটি বাসনার উদ্ভব। কারণ রস আস্বাদনের পরিপাটি যিনি জানেন তিনিই তো নানাভাবে আস্বাদন করেন। আর পরমকারুণ্যে তাঁর কলিজীবের প্রতি নাম প্রেম দান—কলিজীবকে উদ্ধার। কলিজীবকে উদ্ধার করবার জন্য গৌর অবতার নন কারণ ভগবান বলেছেন—

যুগ প্রবর্ত্তন হয় অংশ কলা হইতে।
আমা বিনু অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

পৃথিবীর ভারগ্রহণ, অসুরমারণ, দৈত্যদলন এ সব যে কোন কাজ ভগবানের অংশ অবতার বা কলা অবতার হতে হ'তে পারে কিন্তু স্বয়ং ভগবানের একটাই কাজ সেটি হল জীবকে প্রেমদান। সেই প্রেমদান কাজও গৌরস্বরূপে আনুসঙ্গে হয়েছে। মুখ্য কাজ তাঁর নিজের রস আস্বাদন। সুতরাং তিন বাসনা পূরণ বা নিজের রস আস্বাদনে এইটিই গৌর আবির্ভাবের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ আর কলিজীবের উদ্ধার বা কলিজীবকে নাম প্রেম দান এটি হল বহিরঙ্গ-কারণ বা গৌণকারণ। কারণ এটি আনুসঙ্গে হয়ে গেছে। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বললেন—গরজে পড়ে শ্রীগৌরস্বরূপে কলিজীবের প্রতি এই দান হয়েছে—কারণ "তদ্দানেন তদাস্বাদনম্।" দান বা

বিতরণ না করলে নিজেরও আস্বাদন হয় না। যেমন একজন গায়ক ঘরের কোণে বসে যদি গলা চেপে গান করে তাহলে সকলে তো শুনতে পেলই না—গায়কের নিজেরও এতে আস্বাদন হয় না। পাঁচজনকে শুনিয়ে যখন আসরে বসে গায়ক গান করে তখন সকলে শুনে তৃপ্ত হল —তখন গায়কের নিজেরও আস্বাদন হয়ে যায়। তাই গৌর যদি নিজে রস অর্থাৎ রাধারাণীর প্রেমাস্বাদনের জন্যই অবতীর্ণ হয়ে থাকেন তবু কলিজীবে আচণ্ডালে এই সম্পদ দান না করলে তাঁর নিজেরও আস্বাদন হত না। কলিজীবকে দান করেছেন বলেই গৌরসুন্দরের নিজেরও আস্বাদন করা সম্ভব হয়েছে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন—

হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আস্বাদিতে রাধার প্রেমধর্ম্ম

প্রচারিতে নিজ নামধর্ম্ম

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ।

শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন প্রসঙ্গে গাইলেন—

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে

নিজ নাম প্রেম বিতরিতে

আস্বাদিতে নিজ মাধুর্য্যসীমা

প্রচারিতে নিজ নাম মহিমা

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

রাধাপ্রেমসম্পদ যেটি গোবিন্দস্বরূপে তাঁর নিজ আস্বাদ্য যেটি না হলে গোবিন্দের প্রাণ যেন বাঁচে না—যেটিকে লক্ষ্য করে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ পদ প্রয়োগ করলেন—'উন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্', শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—'স্বপ্রেম-সম্পদ্সুধা' এইটিই গোবিন্দ আজ গৌর হয়ে নিজে আস্বাদন করেছেন এবং কলিজীবে আচণ্ডালে অকাতরে শুধু দান নয় সমর্পণ

অর্থাৎ পাত্র দিয়ে দান করেছেন। রাধাপ্রেমসমর্পণ-লীলায় গৌর আবির্ভাব। দানের পাত্র এখানে তো কলিজীব। কিন্তু ভিখারী যেমন ভিক্ষা গ্রহণ করে তার পাত্রে, গুরুদেব শিষ্যকে উপদেশ দান করেন, শিষ্য তার বুদ্ধি (মেধা) ঝুলিতে গ্রহণ করে—দাতা দান করলেও গ্রহীতাকে কোন পাত্রে অর্থাৎ আধারে গ্রহণ করতে হবে। এখানে শ্রীগৌরসুন্দর আমার মহাবদান্য—ভূরিদাতা তিনি কলিজীবকে প্রেমদানে পাত্র কি অপাত্র বিচার করেন নি—আপন পর ভেদ করেন নি—সময়ের বিচার করেন নি। শ্রীল সরস্বতীপাদ বললেন—

পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে
ন স্বং পরং বীক্ষতে।

কিন্তু গ্রহীতা কলিজীবকে তো আধারে সে দান গ্রহণ করতে হবে। প্রেম রাখার একটাই মাত্র পাত্র বা আধার—সেটি হল হৃদয়, হাতে পায়ে তো প্রেম রাখা যায় না। কলিজীবের হৃদয় অর্থাৎ আমার হৃদয়—এ তো শতছিদ্রপূর্ণ কামকলুষতায় ভরা। এ হৃদয়ে কি রাধাপ্রেমের মত গুরু বস্তু রাখা চলে? আধেয়ের চেয়ে যদি আধার দুর্ব্বল হয় তাহলে আধার তো ফেটে যাবে। যেমন সিংহের দুধ অত্যন্ত তেজস্বী সেটি মাটির পাত্রের মত দুর্ব্বল আধারে রাখা যায় না। পাত্র ফেটে যাবে—স্বর্ণ পাত্রে রাখতে হয়। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বুঝেছেন কলিজীবকে রাধাপ্রেম দান করলেও সে রাখতে পারবে না—তাই পাত্র দিয়ে দান করেছেন। এই পাত্র দিয়ে দানটিকে রূপগোস্বামিপাদ বললেন সমর্পণ। এখন এই পাত্র কি সেটি বুঝতে হবে। শ্রীপাদ রামানন্দ রায়কে উপলক্ষ্য করে গৌরাঙ্গসুন্দর বললেন—যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তাহার স্বরূপ বলি শুন রামরায়॥

এর পরের বাক্য—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণের চেয়েও সুনীচ—এখানে 'অপি' পদের সার্থকতা হল তৃণ পদদলিত হলে মাথা নীচু করে কিন্তু আবার মাথা তুলে দাঁড়ায় কিন্তু যে প্রেমলাভের আশায় হরিনাম করবে তার আর মাথা উঁচু করা চলবে না। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীমুখে বলেছেন—"ভক্তি মহারাণীর রাস্তা সকলের পায়ের তলা দিয়ে। আর তরুর মত সহিষ্ণু হয়ে হরিনাম করতে হবে। মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যটির অনুবাদ করলেন—

বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কভু পাণি না মাগয়॥

বৃক্ষকে কেটে ফেললেও সে কিছু বলে না—এটি তার সহিষ্ণুতার লক্ষণ আর শুকিয়ে মরে গেলেও জল চেয়ে খেতে পারে না। এটি হল তার দারিদ্র্য। এই হল দুটি পাত্র আর তৃতীয়টি হল অমানিনা—নিজেকে সম্পূর্ণ মানশূন্য মনে করে হরিনাম করতে হবে। নিজের সম্মান আছে বলে মনে রাখা চলবে না। যদি কেউ সম্মান করে তাহলে তার বাহবা, সম্মান আছে বলে সম্মান করছে এটি মনে রাখা চলবে না। আর শেষেরটি হল মানদ—অর্থাৎ অপরকে মান দান ক'রে হরিনাম করবে। অপরকে বলতে নিজেকে ছাড়া আর সকলকে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে করি গৌরসুন্দর এইরকম করে কলিজীবকে হরিনাম করতে বললেন এইভাবে হরিনাম করলে তবে প্রেমলাভ হবে—তাহলে আর প্রেমদান হল কোথায়? এতো ভাল মূল্য আদায় করেছেন মূল্য নিলে তো আর তাকে দান বলা যায় না—তাতে মহাজন বললেন—না এর নাম মূল্য নেওয়া নয়—এটি হল গৌরসুন্দরের পাত্র তৈরী করে দেওয়া—পাত্র দিয়ে দান—এর নামই সমর্পণ। তা না হলে কলিজীব তো প্রেম রাখতেই পারে না। এই প্রেম সমর্পণের কথা শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁর বিদগ্ধমাধব নাটকের মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে ইষ্ট বন্দনায়—'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' মন্ত্রে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের মধুর কণ্ঠে উৎসারিত হয়েছে—

আমরি হইল সেই করুণার বিকাশ—

যে করুণা কোনও কালে কেউ পায় নাই

যে করুণা চিরকালের অনর্পিত

যে করুণা গোলোকে গোপনে ছিল

যে করুণা ব্রহ্মাদিরও অনুভব ছিল না

কোটিকল্প কঠোর সাধনেও কেউ যার সন্ধান পায় নাই

আমরি কলিজীবের সৌভাগ্য বশে

করুণাবারিধি শ্রীগোবিন্দ মনে মনে বিচার করিলেন—

(আমি) চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান রে

আমি ভুক্তি মুক্তি দিয়েছি বটে

অষ্টপ্রকার সিদ্ধিও দিয়েছি

চতুর্ব্বিধা মুক্তিও দিয়েছি

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও দিয়েছি

যথাযোগ্য সাধন ফলে

কিন্তু সে ভক্তি তো কাকেও দিই নাই

যে ভক্তি আমায় সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধে

যে ভক্তি আমায় পুত্র সখা প্রাণপতি করে

যে ভক্তি আমায় বশ ক'রে অধীন করে

আমার ঈশ্বর অভিমান ঘুচাইয়ে আমায় বশ ক'রে অধীন করে

সে ভক্তি তো কাকেও দিই নাই।

চিরকাল নাহি করি এই প্রেমভক্তি দান রে।

এই ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান রে॥

যে ভক্তি সম্পদের সংবাদ জগতে কেউ জানত না, কোনও ভগবৎ স্বরূপে যে ভক্তি কখনও কোনও কালে দান হয় নি সেই ভক্তি

ভগবানকে বশ ক'রে অধীন করা ভক্তি, ভগবানকে আপন করা ভক্তি, সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধবার মত ভক্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের স্বরূপেই একমাত্র দান হয়েছে। এটি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কলিজীবের প্রতি অযাচিত করুণা। শ্রীগৌরসুন্দরের এই দান বৈভব যেটি শ্রীরূপগোস্বামিপাদ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন সেইটি শ্রীল বাবাজী মহারাজ বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তনের মাধ্যমে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করে কলিজীবের দৃষ্টি খুলে দিলেন। পদকর্ত্তা শ্রীলোচন-দাসজী যে বলে এলেন—

অবতারসার গোরা অবতার কেন না চিনিলি তারে।
করি নীরে বাস গেল না তিয়াস আপন করম ফেরে॥

গৌর বড় অবতার কেন। সে কথাও শ্রীপাদ কীর্ত্তনে প্রকাশ করলেন—

গৌর আমার বড় অবতার
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥

এই ভক্তিধন লাভ জগতে দুর্লভ। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ হরিভক্তিকে সুদুর্লভা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ভক্তি সম্পর্ক না হলেও মানুষের জীবনে অন্য কোন গতি নেই। শ্রীপাদ সেইটিই প্রকাশ করলেন—

জীব কখনও স্থির হতে নারে।
যতই সাধন করুক না কেন
অহৈতুকী ভক্তির আশ্রয় না পেলে
ব্রজজাতীয় সম্বন্ধ ভক্তির আশ্রয় না পেলে
প্রতিজ্ঞা করলেন শ্রীগোবিন্দ
আমি যারে তারে যেচে দিব
সেই অনর্পিত প্রেমভক্তি
সেই সাধনদুর্লভ প্রেমভক্তি
গিয়ে আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে
দন্তে তৃণ গলবাসে করজোড়ে

যারে তারে যেচে দিব

আমি প্রেম দিব আচণ্ডালে

আমায় সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা

আমায় পুত্র সখা প্রাণপতি করা

আমায় বশ করে অধীন করা

আজ তাই হরি ব্রজবিহারী,

শ্রীনবদ্বীপে অবতরি

নাম ধরি গৌরহরি

আমাদের শ্রীমতীর শ্রীহরি

শ্রীরাধাভাবকান্তি ধরি

নাম ধরি গৌরহরি চাঁদ নিতাই-এর সঙ্গেতে।

অযাচকে যেচে দেয় বলে কে নিবি কে নিবি আয়॥

মার খেয়ে প্রেম বিলায় কে আছে আর জগতে॥

নিরন্তর গৌরভাবনায় যাঁর হৃদয় ভরা, যিনি গৌর ছাড়া আর কিছু জানেন না তিনিই গৌরসুন্দরের মনের খবরটি এমনভাবে ভাষার মাধ্যমে ধরে দিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমদানের আর একটি দিক আছে। বলা হল যে শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবকে প্রেম সমর্পণ করেছেন অর্থাৎ পাত্র দিয়ে দান করেছেন—এ পাত্র দিয়ে দান বলতে কি বুঝায়? পাত্র দিয়ে দান অর্থাৎ হৃদয়-আধারকে তৈরী ক'রে প্রেমদান করেছেন।

হরি বলি বাহু তুলি প্রেম দিঠে চায়।

করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে মাতায়॥

গৌরসুন্দর হরি বলে প্রেমভরা নয়নে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন সেই প্রেমভরে দুবাহু তুলে নৃত্য করেছে—এর নামই পাত্র দিয়ে দান—আর শ্রীপাদ রামানন্দ রায়কে উপলক্ষ্য করে পাত্র তৈরী করার কথাও বললেন। কারণ দয়া করলেই তো দয়া হয় না—দয়া করতে জানা চাই। একজন দয়ালু ব্যক্তি যদি বিষ্ঠার কৃমিকে

পদ্মফুলে বসিয়ে দেন—তাতে দয়া করা হল না। কারণ বিষ্ঠার কৃমি সে বিষ্ঠায় থাকতেই অভ্যস্ত—পদ্মফুলে বসালে সে বাঁচবে না সে মরে যাবে। পদ্মফুল জায়গা ভাল কিন্তু বিষ্ঠার কৃমির তো সেখানে থাকা অভ্যাস নেই। তাই তাকে কেউ যদি ভ্রমর করে পদ্মে বসাতে পারে তাহলে তাকে দয়া করা সার্থক হবে। কারণ ভ্রমরের পদ্মে বসা অভ্যাস আছে। কিন্তু এ সামর্থ্য তো মানুষের থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার সর্ব্বসামর্থ্যবান—তিনি এ দয়া করতে পারেন। তাই বিষ্ঠার কৃমির চেয়েও অধম যে কলিজীব বিষয় বিষ্ঠায় থাকাই যার অভ্যাস তাকে গৌরসুন্দর ভক্ত ভ্রমর ক'রে নিজ পাদপদ্মমধু আস্বাদন করিয়েছেন। এইখানে তাঁর দানের গৌরব এবং বৈশিষ্ট্য। এ দান কোনও কালে হয় নি।

শ্রীগৌরসুন্দর কলিজীবকে নামের কৌটায় প্রেমমণি দান করেছেন। এখানে নাম ও প্রেম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দান নয়। নাম দানই প্রেমদান। নামসংকীর্ত্তন কলিজীবের যুগধর্ম এবং শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু যুগাবতার। যুগাবতারের কাজই হল যুগধর্মটি নিজে আচরণ করে প্রচার করা—তাই শ্রীগৌরস্বরূপে এই নামদান হয়েছে এবং প্রেম-সম্পুটিত কৃষ্ণনাম গৌরসুন্দর দান করেছেন তাই প্রেম আর আলাদা করে দিতে হয় নি। নামপিঠের ভিতরে প্রেমের পুর দিয়ে দিয়েছেন —যেমন চালের গুঁড়ো বা ময়দার পিঠের ভিতর ক্ষীরে পুর দেওয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোচ্চারিত কৃষ্ণনামের মহিমাই এইটি —এই নাম কলিজীব জিহ্বায় যত উচ্চারণ করবে ভিতরে প্রেমের পুরের আস্বাদও তত পেয়ে যাবে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ মহাদানী শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদয়ে ধারণ করে গাইলেন—

যারে তারে পরাইল
বলে, আয় কলিহত জীব
পেয়েছ সাধের মানব জনম

চৌরাশী লক্ষ যোনি ক'রে ভ্রমণ
এ তো ভোগ বিলাসের জনম নয় রে
এ তো রিপু সেবার জনম নয় রে
শৃগাল কুক্কুরের মত „
দেবতারাও বাঞ্ছা করে
শ্রীহরিভজনযোগ্য এই মানবদেহ „
কেন এমন জনম হেলায় হারাও
ধর ধর নামের মালা পর
ত্রিতাপ হর হরিনামের মালা পর
হরিনামের মালা কণ্ঠে পর রে
বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
বল হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ধর পর হরিনামের মালা
দূরে যাবে ত্রিপাত জ্বালা
যাবে জ্বালা পাবে নন্দলালা
হয়ে ব্রজবালা পাবে নন্দলালা
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম
প্রচারিলেন এই নামধর্ম
গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে „

যদি বলা যায় কৃষ্ণভগবানের স্তুতি প্রসঙ্গেও তো বলা আছে—

কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর।

কলিজীবকে নাম-প্রেমদান

কৃষ্ণ যখন করুণাসাগর তখন তিনিও তো জীবকে করুণা করেন তাহলে আবার গৌরস্বরূপে করুণার আধিক্য এটি বলা হল কেন? কৃষ্ণচন্দ্র করুণাসাগর কিনা তাই সাগরের ধর্ম লঙ্ঘন করেন নি। সাগর

যেমন তার বেলাভূমি লঙ্ঘন ক'রে দেশে বন্যা আনে না তেমনি কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পরিকররূপে তটসীমা লঙ্ঘন করে পতিতের জগতে প্রেমের বান ডাকান নি। কিন্তু গৌরস্বরূপের প্রেমবন্যা পতিতের জগতে বান ডাকিয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র যে প্রেমদান করেছেন—তা ঘরে ঘরে নিজ পরিকরের মধ্যে—যেমন শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বললেন—কৃষ্ণচন্দ্র লতাকে পর্যান্ত প্রেমদান করেছেন কিন্তু সে লতা তো বৃন্দাবনের লতা—বৃন্দাবনের লতাকে প্রেম আর আলাদা করে দান করতে হয় না—বৃন্দাবনের তরুলতা, পশু-পাখী, শ্রীযমুনা, গিরিরাজ, গোবর্দ্ধন, আকাশ, বাতাস, ভ্রমর, কোকিল, ময়ূর, কপোত সবই প্রেমবান্ প্রেমবতী কারণ সকলেই তো রাধারাণীর স্বরূপ। শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধারাণীই সেবিকা, গোবিন্দ সেব্য। তাই শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী ভাবেন—একা কতভাবে গোবিন্দ সেবা করব, নিজেকে তাই অনন্তরূপে বিছিয়ে রেখেছেন কৃষ্ণসেবার জন্য। সুতরাং সেখানে সকলেই প্রেমস্বরূপা, আলাদা করে তাদের আর প্রেম দিতে হয় না। আর যদি বা দিয়ে থাকেন—তাহলেও তো নিজ পরিকরকে দান। এ দানের কোন প্রশংসা নেই। রাজা যদি অন্তঃপুরে বসে রাণীমাকে দান করেন তাহলে সে দানের কোন প্রশংসা নেই কিন্তু রাজা যদি দীন, দুঃখী, কাঙ্গালীকে দান করেন তবে তো দানের প্রশংসা। তাই কৃষ্ণচন্দ্রের দানের প্রশংসা নেই কিন্তু গৌরস্বরূপে পতিতজীবকে দান হয়েছে—দানের সেইজন্যই প্রশংসা। এখন কথা হতে পারে সেই কৃষ্ণই তো গৌর, শাস্ত্রের প্রমাণ বাক্য তাই—

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাঞ ॥

আরও বলা আছে—

নন্দের নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।

তাহলে কৃষ্ণস্বরূপে যে দান সম্ভব হয় নি—গৌরস্বরূপে সে দান

সম্ভব হল কি করে ? কৃষ্ণ তো একটি সাগর, তাই তাতে জলোচ্ছ্বাস হয়ে বন্যা হয়নি কিন্তু গৌর তো একটি সাগর নন—গৌরস্বরূপ রাধাকৃষ্ণ মিলিত মূরতি তাই আজ গৌরস্বরূপে কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে রাধাসাগর মিলেছেন—দুটি সাগরের মহামিলনে করুণাবারির উচ্ছ্বাস আজ ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়েছে—গৌরের প্রেমবন্যায় আজ জগৎ ভেসে গেছে—

শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।

গৌরস্বরূপের নিত্য পার্ষদের তটসীমা লঙ্ঘন করেছে। রসরাজ মহাভাব দুই সাগরের মিলনে এটি সম্ভব হয়েছে। এটিও গৌরস্বরূপে আর একটি অপূর্ব্বতা। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীসূচক কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রে গাইলেন—

"প্রেমসিন্ধু গোরা রায় নিতাই তরঙ্গ তায়
করুণা বাতাস চারিপাশে।"
প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাফাল ছাড়ে

তাতে অক্ষর দিলেন—

উথলিয়া ভাসায় রে
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমসিন্ধু
প্রেমজলে ডুবায় রে
প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাফাল ছাড়ে
জপতৃষ্ণা সবাকার নাশে॥
ও ভাই দেখ, দেখ, নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
এমন হয় নাই আর হবার নয় রে

এই গৌর প্রেমসিন্ধুতে ডুব দিয়ে ভকতি সিদ্ধান্ত রত্নমালা তুলেছেন শ্রীরূপ সনাতন। সংসারে সাঁতার ভুলে যারা গৌর-প্রেমসিন্ধুতে ডুব দিতে পারেন তাঁরাই এই ভকতিসিদ্ধান্ত রত্নমালার সন্ধান পান।

শ্রীপাদ অক্ষর দিয়েছেন—

ডোবা তো যায় না

ডোবা তো যায় না

সংসার সাঁতার না ভুলিলে ”

আমি আমার না ভুলিলে ”

আমি তোমার না হইলে ”

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীল কবি কর্ণপূর গোস্বামিপাদ বললেন—নদীতে যখন প্লাবন থাকে না তখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার জন্য নদীর বাঁকে বাঁকে নৌকা চালাতে হয়—তাতে পথ দীর্ঘ হয়, পরিশ্রম হয় এবং পৌঁছুতেও দেরী হয়। কিন্তু সেই নদীতে যখন বন্যা আসে তখন আর দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয় না। বন্যার জলে সব ভেসে একাকার হয়ে যায়। তখন সোজাসুজি নৌকা চালিয়ে গন্তব্যস্থানে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো যায়। পথ সহজ হওয়ায় পরিশ্রমও কম হয়। তেমনি গৌরের প্রেমবন্যা যখন হয় নি তখন সাধককে সাধনের বাঁকে বাঁকে যেতে হত—শাস্ত্রসম্মত বিধি বিধানে চলতে হত। কিন্তু আজ গৌর-প্রেমবন্যার যুগে আর সাধনগতির বাঁকে বাঁকে যেতে হবে না—'হা গৌর' বল আর চল পথ এখানে সহজ হয়েছে পরিশ্রমও কমে গেছে। প্লাবন যেমন জোর করে সব ভাসিয়ে দেয়—তেমনি গৌরসুন্দরের প্রেমবন্যা কলিজীবের বিষয়-বাসনা, অনাদিকালের দুর্ব্বাসনা মালিন্যকে ভাসিয়ে দিয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বুঝেছেন উপদেশ দিলে কলিজীব বিষয় ত্যাগ করবে না—উপদেশে কোনও কাজ হবে না—তাই প্লাবন ঘটিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে গৌর তো তাদের জিনিষ কেড়ে নিয়ে ব্যথাই দিলেন। না, ব্যথা দেন নি। কারণ যে বিষয়বাসনারূপ সম্পদ কলিজীব হারাল তার পরিবর্ত্তে সে যদি রাধাপ্রেম সম্পদ্ লাভ করে তাহলে আর তার হারানোর জন্য আক্ষেপ হবে কেমন করে? মহাপ্রভু প্রেমমণি দান করলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁর শ্রীগুরুপাদপদ্মে আর্ত্তিভরে বলছেন—

হে পরম করুণ শ্রীগুরুদেব

আমরা বিষয় বিষ পিতে ছিলাম সুধা হতেও সুধা মেনে

তুমি হাত হ'তে কেড়ে নিলে

খেও না জ্বালায় জ্বলবে ব'লে ,,

নাম অমিয়া পিয়াইলে

আমরা পিতে চাই নাই তুমি চিয়াইয়ে ,,

পর পর হরিনামের মালা পর

ত্রিতাপ হর হরিনামের মালা পর

বন্যার জলে ছেঁড়াকাপড়ের বস্তা আবর্জনা ভেসে যায় আবার অনেক সময় বন্যার জল মহামূল্য রত্নও ঘরে এনে দেয়। এখানেও কলিজীবের বিষয় বাসনা ভাসিয়ে দিয়ে প্রেমমণি রাধাপ্রেম গৌরসুন্দর কলিজীবকে লাভ করিয়েছেন বলে তার আক্ষেপের তো কিছু নেইই বরং আনন্দ সাগরে ডুবেছে। তপ্ত মরুভূমি থেকে উঠে সে যেন অমৃতসাগরে অবগাহন করেছে। রাধাপ্রেম পাওয়া তো দূরের কথা, পাবার ইচ্ছাও কলিজীবের অন্তরে জাগতে পারে না—কারণ এটি অসম্ভব বস্তু। অসম্ভব বস্তুতে তো ইচ্ছা জাগে না। যেমন মর্ত্যবাসী কেউ দেবরাজ ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীকে ভোগ করবার বাসনা করতে পারে না। কলিজীবের পক্ষে আত্মজ্ঞানের বাসনাই জাগে না, রাধাপ্রেম আস্বাদনের বাসনা জাগা তো সুদূর পরাহত। সেই রাধাপ্রেম সমর্পণ লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শ্রীগৌরসুন্দরের এই যে দান—এটি বিষয় বাসনা ছাড়িয়ে প্রেমদান নয়, কিন্তু প্রেম দিয়ে দিয়ে বিষয়বাসনা ছাড়ান। একজন ব্যক্তি জলভরা ঘটি নিয়ে কোনও দুধদাতার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে জল ফেলব না কিন্তু দুধ চাই। দাতা বলছেন জল ফেলে দিয়ে ঘটি খালি কর তবে তো দুধ দেব। সে বলে না জল আমি ফেলব না, এতে দুধ দিতে হয় দিন আর না দিতে হয় না দিন। দাতার ভাণ্ডারে যদি দুধ সীমিত হয় তাহলে তো দুধ দেওয়া সম্ভব হবে না। আর যদি

অপরিমিত ভাণ্ডার হয় তাহলে ঘটিভরা জলের উপরই দুধ ঢালতে লাগলেন জলে দুধ মিশে মিশে পড়ে যেতে লাগল ; অনেকক্ষণ সময় লাগল বটে কিন্তু শেষে একসময় দেখা গেল সমস্ত জল পড়ে গিয়ে ঘটিটি খাঁটি দুধে ভরে গেছে। তাই এখানে কলিজীব বিষয়বাসনার-রূপ জল ফেলবে না, বাসনা ছাড়তে রাজী নয় অথচ প্রেমামৃত দুধ পেতে চায়, এখন উপায় কি ? কিন্তু প্রেমামৃতের ভাণ্ডার তো অফুরন্ত কাজেই কোন অসুবিধা নেই। গৌরসুন্দরের সে প্রেমবন্যায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভেসে গেলেও তাঁর এতটুকু কমবে না। যে কৃষ্ণচন্দ্রের একপাদ বিভূতি দিয়ে অনন্তকোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধরা আছে তিনিও যে রাধাপ্রেমে হাবুডুবু খান সে রাধারাণীর প্রেমভাণ্ডার সম্বন্ধে আর কি কথা ? শ্রীল বাবাজী মহারাজ গাইলেন,—

প্রেম ঘৃত ঢেলে ঢেলে

বাসনা আদি কাষ্ঠগণ প্রেমঘৃত নির্মচ্ছন

তাতে যজ্ঞ অগ্নি হইল প্রবল।

গৌররাজ্যে ভগবৎ প্রীতি দিয়ে অন্য প্রীতি কমানোর ব্যবস্থা। আমাদের ভগবৎ প্রীতি নেই বলে অন্য প্রীতি। ভগবৎ প্রীতি হলে আর এ বিষয় প্রীতি ত্যাগে আক্ষেপ হবে না। গোপরামারা বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণঅধরামৃত ইতর রাগ (কৃষ্ণেতর রাগ) ভুলিয়ে দেয়।

"ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্"।

শ্রীপাদ কলিজীবের প্রতি করুণা করে প্রার্থনা করলেন—

সবাই হৃদে ধরুক আর গুণে ঝুরুক

মায়া বন্ধন ঘুচুক সবার

তোমায় লয়ে করুক সংসার।

গৌর স্বরূপে রসাস্বাদন

গোরা নামের রহস্য

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর ।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে ভোর ॥

গম্ভীরা মন্দিরে মধুর শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত। কারণ রাধারাণীর ভাব কান্তি গ্রহণ ক'রে গোবিন্দ যখন গৌর হলেন তখনই তাঁর সেই স্বরূপে তিন বাসনা পূরণ হবে। আশ্রয় জাতির আস্বাদন বিষয় জাতির পক্ষে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না যতদিন বিষয় জাতি নিজে আশ্রয়জাতি হ'তে না পারে। এখানে রাধাগোবিন্দের লীলা মধুর রসের লীলা এই রসের আশ্রয় জাতি রাধারাণী বিষয়জাতি গোবিন্দ। তাই গোবিন্দ যদি রাধারাণী হ'তে পারেন তাহলে রাধারাণীর আস্বাদন পেতে পারেন। রাধারাণী হওয়া মানে রাধারাণীর স্বরূপে যা আছে তা নেওয়া। রাধারাণীর স্বরূপে তো দুটি জিনিষ—ভাব অর্থাৎ মহাভাব যা কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত স্বরূপ আর কান্তি অর্থাৎ অঙ্গকান্তি। এই দুটি রাধারাণীর স্বরূপের উপাদান—তাই এই দুটি নিতে পারলেই রাধারাণী হওয়া হল এবং রাধারাণী হ'তে পারলেই গোবিন্দের তিন বাসনা পূরণ হবে অর্থাৎ আশ্রয় জাতির আস্বাদন পাওয়া সম্ভব হবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে রাধারাণীর মহাভাব এবং কান্তি শ্রীগোবিন্দ নিলেন কি করে ? সে সংবাদ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁর অষ্টকে দিয়েছেন—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুম্ কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতির্মাতিতরাং ন কৃপয়তু ॥

ব্রজের নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীমতী রাধারাণী আছেন সেখানে শ্রীগোবিন্দ প্রবেশ করে রাধারাণীর অপার রসভাণ্ডার লুঠ করলেন। গোস্বামিপাদ হৃ ধাতুর প্রয়োগ করলেন—অর্থাৎ হরণ করলেন চুরি করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ যিনি স্বরূপে রূপমঞ্জরী নিকুঞ্জের দ্বারে বসে আছেন—দেখছেন—কৃষ্ণ রাধারাণীর প্রেমভাণ্ডার হরণ করলেন। কিন্তু এখানে তো রাধারাণী বা কৃষ্ণচন্দ্র কারও নাম তো এই মন্ত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। গোস্বামিপাদ তাঁদের নাম করে বলেন নি—ইঙ্গিতে বলেছেন। কস্যাপি—প্রণয়িজনবৃন্দ বলতে রাধারাণীকে এবং কুতুকী বলতে কৃষ্ণকে বুঝিয়েছেন কেন? স্পষ্ট করে বললেন না কেন? বলতে পারেন নি। কারণ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীশুকদেবের আনুগত্যে কথা কইছেন। শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে রাধাগোবিন্দের লীলাকথা বলেছেন কিন্তু কোথাও শুধু রাধারাণী নয় কোন গোপরামারই নাম করে বলেন নি—ইঙ্গিতে বলেছেন গোপী উবাচ, গোপ্য উচুঃ ইত্যাদি। কারণ রাধারাণীর শুকদেবের ওপরে নিষেধাজ্ঞা ছিল—শুক আমাদের লীলাকথা বলবে কিন্তু যেন নাম করে করে বলো না—কারণ গোবিন্দের সঙ্গে আমাদের পরকীয়া রসের লীলা—নাম করে বললে আমরা লজ্জা পাব। রাধারাণীর করলালিত শুক সে নিষেধাজ্ঞা বরাবর পালন করেছেন—সেই শুকদেবের আনুগত্যে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ কথা কইছেন কাজেই তিনিও নাম করে বলতে পারেন নি—রাধারাণীকে বুঝতে গিয়ে বললেন কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য। রাধারাণীর নাম না হয় না করলেন—কিন্তু কৃষ্ণের নাম করলেন না কেন? কুতুকী বলতে কৃষ্ণকেই বুঝিয়েছেন। কৃষ্ণের নাম করতে পারেন নি—তার কারণ আছে। কারণ কৃষ্ণকে দেখছেন চুরি করতে। গুরুজনকে যদি চুরি করতে নিজের চোখে দেখাও যায় তাহলেও মুখ ফুটে বলা যায় না। লজ্জা করে। তাই বলতে পারেন নি। সেইজন্য ইঙ্গিতে বললেন।

এখন রাধারাণীর অপার রসভাণ্ডার যে গোবিন্দ চুরি করলেন

—চুরি করবার তো দরকার ছিল না। চাইলেই পারতেন। ওগো প্রেমময়ী রাধে তোমার প্রেম আমাকে কিছু দাও আমি আস্বাদন করব। চাইলে কি রাধারাণী দিতেন না? তাঁর তো কৃষ্ণকে কিছু অদেয় নেই। "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে—যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" এই তো রাধারাণীর স্বরূপ। চাইলে দিতেন কিন্তু হাততোলা দিতেন তো। লোকে বলে চুরি করতে গেলি কেন? চাইলেই পারতিস্ দিতাম। চাইলে লোকে দেয় কিন্তু বেশী তো দেবে না। কম দেবে। কিন্তু গোবিন্দের তো কম পেলে হবে না—নিজে আস্বাদন করবেন তো বটেই আবার সঙ্কল্প আছে এই প্রেমসম্পদ আমি আচণ্ডালে বিতরণ করব। কেন? নিজে আস্বাদন করবেন তাই করুন—আবার আচণ্ডালে বিতরণ করব—এ সঙ্কল্প কেন? শুকদেবের কথা শুনে এ সঙ্কল্প জেগেছে। মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় শ্রীশুকদেব বসেছেন—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাম্।
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ॥
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

ভাঃ ৫।৬।১৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভজনের বিনিময়ে অন্য সম্পদ এমন কি পঞ্চবিধা মুক্তি পর্য্যন্ত দেন কিন্তু প্রেমভক্তি কাউকে একটা দেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও বললেন—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

শ্রীগোবিন্দের এ কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে। এতবড় সভার মাঝে শুক আমাকে কৃপণ বলে গেল—আমি প্রেমভক্তি কাউকে বড় একটা দিই না? কৃপণতা তো দোষ—আমি এই কৃপণতা দোষ সারিয়ে দাতা হতে চাই। তাই এই সঙ্কল্প। বলা আছে—

যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ কইল অন্তর্ধান।
অন্তর্ধান করি করে মনে অনুমান॥
আমি চিরকাল নাহি করি এই প্রেমভক্তিদান
এই ভক্তি বিনু জগতের নাহি অবস্থান॥

এখন এত সম্পদ তো চাইলে পাওয়া যায় না—তাই চুরি করলেন। চুরি তো করলেন কিন্তু রাখলেন কোথায়? প্রেম তো বাক্সবিছানা নয় যে মাথায় করে পিঠে করে বয়ে আনবেন। প্রেম রাখবার তো একটিই জায়গা সেটি হল হৃদয়। হাতে পায়েও প্রেম রাখা যায় না। রাধারাণীর প্রেমভাণ্ডার লুট করে গোবিন্দ হৃদয়েই রেখেছেন নিজের হৃদয়ের সঙ্গে রাধারাণী হৃদয় মিশিয়ে দুটি হৃদয় এক করে নিকুঞ্জ মন্দির থেকে বেরুচ্ছেন তখন আর চিনবার উপায় নেই কোনটি রাধা হৃদয় আর কোনটি গোবিন্দ হৃদয়। রাধা হৃদয় আর কৃষ্ণ হৃদয় কেমন করে মিশেছে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ একটি উপমা দিয়ে বললেন যেমন দুখণ্ড গালা যাকে লাক্ষা বা জতু বলা হয় একটি রামের গালা আর একটি শ্যামের গালা আগুনের তাপে গলিয়ে মিশিয়ে এক করে দিলে বুঝবার উপায় থাকে না কোনটি রামের গালা কোনটি শ্যামের গালা। এখানেও তেমনি রাধারাণীর হৃদয়রূপ জতু আর কৃষ্ণের হৃদয়রূপ জতু আজ প্রেমের তাপে মিশে গলে এক হয়ে যখন গৌর হয়ে প্রকাশ পেলেন তখনও গৌরস্বরূপ বুঝা যাচ্ছে না—কোনটি রাধাহৃদয় আর কোনটি গোবিন্দহৃদয়। বলা আছে একীভূতং বপুরবতু বঃ।

হ্যাঁ, তবু বুঝা যাবে। কৃষ্ণকে তো চোর বলে ধরে ফেলবে। তার কাল বরণ দেখে। কারণ ব্রজে কৃষ্ণ কালিয়া কপট চোর এতো সবাই জানে। এইজন্য গোস্বামিপাদ বললেন কৃষ্ণ গায়ে রং মেখেছেন—রুচং স্বামাবব্রে—কারণ রাধারাণীর শুধু ভাব নিলে তো সম্পূর্ণ রাধারাণী হওয়া হল না—আর সম্পূর্ণ রাধারাণী হতে না পারলে তো গোবিন্দের বাসনা পূরণও হবে না। রাধারাণীর স্বরূপে ভাব ছাড়া আর একটি জিনিষ আছে সেটি হল কান্তি অর্থাৎ রং। কৃষ্ণ ঐ

স্বর্ণকান্তি দিয়ে নিজের কাল বরণ ঢাকলেন তাই গৌরস্বরূপে এখন আর কালবরণ ধরা যাচ্ছে না—রং ফিরে গেছে। এখন রাধারাণীর সোনার বরণ নেওয়ার পরে শ্যাম হলেন সোনার গৌর। শ্যামসুন্দর হলেন গৌরসুন্দর। যেমন চৈত্র বৈশাখ মাসের সবুজ রংএর কাঁচা আম জ্যৈষ্ঠ মাসের তাপ পেয়ে পেকে লাল বা হলদে হয়ে যায়। এখানেও রসে কাঁচা শ্যামসুন্দর আজ প্রেমের তাপে পেকে গিয়ে রসে পাকা গৌর হয়েছেন। এখন গোবিন্দের গৌর হওয়া সার্থক হল।

রাইএর বরণ শ্যামের গঠন
কিশোরী বরণ কিশোর গঠন

গৌর হওয়া সার্থক হলেই গোবিন্দের বাসনা পূরণ হবে। তাই গৌরস্বরূপে গোবিন্দের তিন বাঞ্ছা পূর্ত্তি।

শ্রীগম্ভীরা মন্দিরে রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিশুদ্ধ রাধা মহাভাবনিধি নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করেন। এখানে গৌরসুন্দর রাধারাণীর দশমী দশায় সদাই বিভোর। রাধিকাভাবিতমতি গৌর আমার দশমীদশাসম্পন্ন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করছেন—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ এ নাম যুগলবিলাস ধাম—এই মহামন্ত্র নামের মাঝে ব্রজলীলারস পূর্ণ আছে।

সকলই আছেন মূর্ত্তিমান
পূর্ব্বরাগ হ'তে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান
তাই এই মহামন্ত্র মহাশূর
যদি কারও ভোগ করতে সাধ থাকে
রাধাকৃষ্ণ যুগল উজ্জ্বল বিহার
তবে যাও ভাই এই নামের কাছে
শ্রীগুরুদেবের পাছে পাছে
এই নাম সব ভোগ করাবে

শ্রীরাধারমণের রহোলীলা
যুগল সেবামৃত সমুদ্রে ডুবায়ে
মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন
পরাণ গৌরাঙ্গ দেখায়
'হরেকৃষ্ণ' নাম নিজস্বরূপ
দেখায় প্রাণের গৌর মূরতি
মহারাস বিলাসের পরিণতি
রাইকানু একাকৃতি
ভানুসুতামণ্ডিত নন্দসুত
দেখায় মধুর গৌরদেহ
নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ
দেখায় চিতচোরা গোরা
'হরেকৃষ্ণ' নাম নিজ স্বরূপ
পরস্পর বুকে ধরে আত্মহারা
বিলাস বিবর্ত্ত রসে ভোরা
গৌর অনুরাগীর বুক ভরা

গৌর অনুরাগী যারা তাদের গোরা নামে বড় আবেশ—তাই বলেছেন—

গৌর অনুরাগী যারা
আন নাম বলে না তারা
গৌরের তো অনেক নাম আছে
সবাই বলে 'গোরা' 'গোরা'
গোরা নামে আবেশ তাদের
যত আছে পদকর্ত্তা
শ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুভূত অক্ষর—
না জানি কি রস আছে
গৌরহরির গোরা নামে

ও নামে আছে ভোগ ভরা
সেই ভোগলিপ্সু হ'য়ে তারা
বলে গোরা গোরা গোরা গোরা
হয়ে গদগদ মাতোয়ারা

যদি বলা যায় 'গোরা' নামে গোবিন্দের 'গো' ও রাধার 'র'—এই দুইএ মিলে নাম 'গোরা'—তাই নামের মাঝে স্বরূপের ভোগ রাধাগোবিন্দের মিলিত মূরতি গৌর এই 'গোরা' নামের মাঝেই বলে দিচ্ছে—তাই গৌর অনুরাগীর 'গারা' নামে এত ভোগ। কিন্তু এ কথা বলাও তো ঠিক হবে না। কারণ যুগল রাধাগোবিন্দ নাম গ্রহণের একটি রীতি আছে। আগে আশ্রয়তত্ত্বের নাম উচ্চারণ ক'রে পরে বিষয়তত্ত্বের নাম গ্রহণ। সুতরাং আগে 'রাধা' নাম পরে 'গোবিন্দ' নাম—তবে নাম গ্রহণের রীতি বজায় থাকবে। কিন্তু 'গোরা' নামে তো সেটি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই শ্রীপাদ বললেন—

গোরা নামে যে বিপরীত দেখি
আগে গোবিন্দ পরে রাধা
এই দুইএ মিলে নাম গোরা

পরম অনুভবী শ্রীল বাবাজী মহারাজ এ রহস্য উদ্ঘাটন করলেন—

অনুভব কর ভাই রে
আমার গৌরাঙ্গরাজ্যে বিবর্ত্ত ঘটনা
কোন গোবিন্দের 'গো' কোন রাধিকার 'রা'
অপরূপ রহস্য ভাই
সেই দশাতে নাম 'গোরা'
শ্রীগুরুকৃপা প্রেরণার বলি
বিবর্ত্ত শ্রীশ্যামসুন্দর
স্বমাধরী ভোগ করিতে

শ্যামসুন্দর রাধারাণীকে ভাবতে ভাবতে রাধা হয়েছেন আবার রাধারাণী শ্যামসুন্দরকে ভাবতে ভাবতে শ্যামসুন্দর হয়েছেন।

রাধারাণী গোবিন্দ ভাবতে ভাবতে গোবিন্দ হয়েছেন—আবার গোবিন্দ রাধারাণীকে ভাবতে ভাবতে রাধারাণী হয়েছেন।

তাই বিবর্ত্ত শ্রীশ্যামসুন্দর
আবার বিবর্ত্ত হইলেন রাধা
আপন মাধুরী ভোগে উঠল সাধা
এই দুইএ মিলে হ'ল 'গোরা'
বিলাস বিবর্ত্ত রসে ভোরা
তাই নামে হয়েছে বিবর্ত্ত
স্বরূপে বিবর্ত্ত তাই নামেও বিবর্ত্ত
দুই মিলে নাম গোরা।

বিবর্ত্ত গোবিন্দের 'গো' আর বিবর্ত্ত রাধার 'র'—রাধারাণী গোবিন্দ ভাবতে ভাবতে যে গোবিন্দ হয়েছেন—এ গোবিন্দ তো আসল গোবিন্দ নন—ইনি হলেন বিবর্ত্ত গোবিন্দ আবার গোবিন্দ যে রাধারাণীকে ভাবতে ভাবতে রাধারাণী হয়েছেন—ইনিও আসল রাধা নন—ইনি হলেন বিবর্ত্ত রাধা। তাই 'গোরা' নামে নাম গ্রহণের রীতিও বজায় রইল। 'বিবর্ত্তগোবিন্দ' বলতে রাধারাণী আর বিবর্ত্ত রাধা বলতে 'গোবিন্দ'। সুতরাং রাধারাণী আশ্রয়তত্ত্ব তাঁর নাম যে আগে গ্রহণ করার নিয়ম—সেটিও এতে ঠিক বজায় রইল।

ঐ নামেই স্বরূপ বলে দিছে
প্রাণে প্রাণে ভোগ করে
গৌর অনুরাগী যারা
মুখে 'গোরা' 'গোরা' বলে—

কারণ যে যা ভোগ করে উদ্গারে তা বুঝা যায়। বিলাস বিবর্ত্ত বিলাস রঙ্গে তাদের বুকভরা তাই উদ্গার ক'রে মুখে বলে 'গোরা' 'গোরা'।

এখানে ভোক্তা (শ্রীগোবিন্দ) আর ভোগ্য (রাধা) এক ঠাঁই জড়াজড়ি। কিন্তু ভোক্তা ও ভোগ্য স্বতন্ত্র স্বরূপ না হলে তো ভোগ হয় না। তাই যোগমায়া লীলাশক্তি যুগলকে সুখ দেবার জন্য অভিন্ন স্বরূপের প্রকাশ করলেন। রাধাগোবিন্দ বিবর্ত্তবিলাসে যখন দুইএ মিলে গৌর হয়েছেন তখন তাঁকে সুখ দিতে অভিন্নস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের প্রকাশ। পাণিহাটিগ্রামে বসে এই অভিন্ন স্বরূপের কথা গৌর বলেছেন—

"শুন রাঘব তোমায় আমি নিজ গোপ্য কই হে
আমায় দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই হে।
এক আত্মা দুই কলেবর

প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরসুন্দর এক আত্মা দুই কলেবর গৌরহরি বললেন—

"এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে।"

যেমন নাচায় তেমনি নাচি—আমি নিতাই চাঁদের খেলার পুতুল অভিন্ন স্বরূপ হলেও সম্বন্ধ ছাড়ে নি ভোক্তা আর ভোগদাতা—

এক স্বরূপ ভোগ লিপ্সু, আর এক স্বরূপ সেবা পিপাসু ভোগের স্বরূপ গৌরাঙ্গ নাম, সেবার স্বরূপ নিত্যানন্দ রাম।

আমার নিত্যানন্দ রাম পূরায় শ্রীচৈতন্যের কাম
গোদাবরী তীরে—এই নিতাই গৌর জড়িত
এই নিতাই গৌর আলিঙ্গিত
এই নিতাই গৌর বিলসিত
রসরাজ মহাভাব প্রত্যক্ষ ক'রে রামরায় মূরছিত
সর্ব্বোপরি তত্ত্ব নিতাই গৌরাঙ্গ স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥
যা দেখি রায় রামানন্দ মূরছিত।
রামরায় পড়ল ধরা

দেখি নিতাই রমণ গোরা নিত্যানন্দ রমে গোরা
সঙ্কীর্ত্তন রাসরঙ্গে
বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গে
চৌদ্দ মাদল বাজাইয়ে

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে নিত্যানন্দ রমণে মাতা এই গৌরমূর্তি হৃদয়ে ধরতে হবে তবে গৌররহস্য ভোগ হবে। ব্রজের নিকুঞ্জ বিহারে প্রবেশ না হ'লে নদীয়া বিহার বুঝা যায় না। যুগল-বিলাস বুঝলে তার নদীয়া লীলার ভোগে লোভ হবে। কারণ ব্রজে তো তা পায়নি। নদীয়া লীলা ভোগে সাধ জাগতে তখন গৌরগণের আনুগত্যে নদীয়াতে আসতে হবে।

ব্রজে যারা নদীয়ায় তারা
নদীয়ায় কেবল ভোগাধিক্য
আমার চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গ
বিবর্ত্তে বিরহ রঙ্গ

শ্রীপাদ অশেষ বিশেষে রসাস্বাদী—তাই নিজের মনের গোপন কথা বাসনারূপে কীর্ত্তনের মাধ্যমে জানালেন—

সেই গৌর রহস্য ভোগ করি আয়
গান ছলে ভাই ভাই
নিকুঞ্জ কেলি বিলাস অনুশীলনে

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁর এই অনুভব কীর্ত্তনের মাধ্যমে জানিয়েছেন বলেই জগবাসী নররারী এর সন্ধান পেয়ে আজ কৃতকৃতার্থ হয়েছে।

সংকীর্ত্তন পিতা গৌরহরি

নাম মালার রহস্য

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিতাই গৌরের বন্দনা গেয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বললেন—গৌরসুন্দর শ্রীসংকীর্ত্তন পুত্রের পিতা এবং নিতাইচাঁদ হলেন মাতা।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

পিতা এবং মাতার মিলনে পুত্রের জন্ম হয়। একটি শিশুপুত্রকে দেখলেই বুঝে নিতে হবে তার একজন পিতা আছে এবং একজন মাতা আছে—তেমনি সংকীর্ত্তন পুত্রের পিতা হলেন শ্রীগৌরসুন্দর এবং মাতা হলেন শ্রীনিতাইচাঁদ। এখন প্রশ্ন হতে পারে সংকীর্ত্তনকে পুত্র বলে কোথাও কি উল্লেখ করা আছে? হ্যাঁ, সংকীর্ত্তন পুত্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র মহাজন বললেন—

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সপুত্রায় সভৃত্যায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

গৌরসুন্দরকে একা প্রণামের তো রীতি নেই—বলা আছে—

ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয়॥

এখানে জগন্নাথ নন্দনকে প্রণাম করছেন—যাঁর লীলা ত্রিকালসত্য।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

এই ভাগ্যবান বলতে কাকে বুঝায়—

শ্রীল বাবাজী মহারাজের আস্বাদন—

শ্রীগুরুকৃপায় যাদের প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে সেই ভাগ্যবান জনে দেখিছে। শ্রীজগন্নাথশচীসুতকে পুত্রের সঙ্গে ভৃত্যের সঙ্গে কলত্রের সঙ্গে প্রণাম।

ভৃত্য বলতে না হয় ভক্তকে বুঝান হল কিন্তু পুত্র ও কলত্র বলতে কাকে বুঝাচ্ছে? মহাপ্রভু তো সন্ন্যাসী। তাঁর তো পুত্র (ঔরসজাত সন্তান) নেই আর 'কলত্র' অর্থ হল স্ত্রী কিন্তু সন্ন্যাসী গৌরকে যদি স্ত্রীর সঙ্গে প্রণাম করা যায় তাহলে তো মানায় না বরং অসামঞ্জস্য হয়। তাই মহাজন আস্বাদন করেছেন এখানে পুত্র বলতে সংকীর্ত্তনকে বুঝান হয়েছে। এই সংকীর্ত্তন পুত্রের জন্মদাতা হলেন গৌরহরি। যিনি জন্মদাতা তাঁকেই পিতা বলা হয় তেমনি সংকীর্ত্তন পুত্রের জন্মদাতা আমার শ্রীগৌরসুন্দর। কারণ গৌর যখন শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হন সেইক্ষণে ফাল্গুনী পূর্ণিমা রজনীর সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। গ্রহণকালে সকলেই হরিনাম করে 'হরি' 'হরি' বলে তাই সেই আবির্ভাব ক্ষণটি চারিদিকে হরিনামের ধ্বনিতে মুখরিত হল। এই নাম সংকীর্ত্তনকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর আবির্ভাব বলেই তাঁকে সংকীর্ত্তন পিতা বলা হয়েছে। কলিজীবের গতি—শুধু গতি নয়, একমাত্র গতি হল এই নামসংকীর্ত্তন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি—এই চারটি যুগ এই চারযুগের চারটি ধর্মের কথা শাস্ত্র বলেছেন। শ্রীশুকদেবের বাক্যে বলা আছে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

সত্যযুগে ধ্যান বা তপস্যা, ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা অর্থাৎ পূজা এবং কলিযুগে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন। এরই নাম যুগধর্ম। কলিযুগে শ্রীনামসংকীর্ত্তনই যুগধর্ম। যে ভগবান যেই যুগের যুগধর্মটি নিজে আচরণ করে প্রচার করেন তাঁকেই সেই যুগের যুগাবতার বলা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই হরিনাম সংকীর্ত্তন

নিজে আচরণ করে প্রচার করেছেন তাই তিনিই কলিযুগের যুগাবতার। গোস্বামিপাদের বাক্যে বলা আছে—

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল খেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

এই কলিযুগোচিত নামসংকীর্ত্তনের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহারাজ গাইলেন—

ঘোর কলিযুগে এই তো পরিত্রাণের মূলমন্ত্র
এ যে বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম
চারিবেদ চৌদ্দশাস্ত্র আঠার পুরাণতন্ত্র
গীতা আদি করিয়া মন্থন।
এই হরেকৃষ্ণ নামের প্রকাশ

এই নামও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ কারণ নাম ও নামী অভিন্ন।

তাই শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রাণের আস্বাদনে ভরা অক্ষর—

অদ্বয় ব্রহ্ম নন্দনন্দন পেতে এই নাম বই আর সাধন নাই রে।
অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ পেতে এই নাম বই আর সাধন নাই রে।
সচ্চিদানন্দঘন মূরতি দেখতে এই নাম বই আর সাধন নাই রে।
অপরূপ নাম সংকীর্ত্তনের মহিমা
খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয় রে।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয় রে॥
হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম পূরে ভাই মনস্কাম
নামে পাপ হরে আর তাপ হরে
শুদ্ধ পাপ তাপ দূরে যায় তাই নয়

যদি কেহ নাম বলব বলে মনে করে আগেই তার পাপ তাপ সব পলায় দূরে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অন্ধকার রাশির মত তার পাপ তাপ সব

পলায় দূরে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরম আস্বাদনের বস্তু তাঁর শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকমের প্রথম বাণীটি শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ অক্ষরের মাধ্যমে পরিবেশেন করেছেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্

শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্॥

চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

অনাদিকালের দুর্ব্বাসনা মালিন্যপূর্ণ

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তনে

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভ এবং অশুভ কর্মকেই অজ্ঞানতা বলা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বাঞ্ছা সবই এই অজ্ঞানতার প্রকাশ। মুক্তি বাঞ্ছা এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপটতা। কারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম ছেড়ে বাসনা অন্যত্র গেলেই তার নাম কপটতা। শ্রীপাদ বললেন—

কৃষ্ণ ভজে চতুর্ব্বর্গ বাসনা—এর নাম কপটতা। ভজছি গোবিন্দ পাদপদ্ম আর চাইছি ধর্ম্ম, অর্থ, বাসনা পরিপূরণ ও মুক্তি। এরই নাম কপটতা।

ধর্ম্ম অর্থ কামনা চাইলেও তার হয়ত কোনদিন কৃষ্ণভক্তিতে লোভ জাগতে পারে কারণ এই সব বাসনা পরিপূরণে মানুষ দেখে যে ফল পাচ্ছে কিন্তু আয়ু যশ, আরোগ্য পুত্র অর্থ স্বর্গ কোনটিই তো স্থায়ী হচ্ছে না সবই তো হারাতে হয়—তাহলে এমন ফল কি নেই যা পেলে আর হারাতে হবে না, যে ফল শাশ্বত চিরন্তন হয়ে থাকবে—তাই সেই ফল পাওয়ার আশায় ভক্তিতে লোভ জাগতেও পারে কিন্তু মুক্তি পেলে তার হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তিতে লোভ কিছুতেই জাগে না। কারণ মুক্তির আনন্দে সে এমনই মেতে থাকে যে যাতে করে এর ওপরে

অন্য কোন আস্বাদন, অন্য কোন ফল আছে এ তার মনেই জাগে না। তাই মুক্তি বাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা বলা হয়েছে। মুক্তিতে জন্ম মৃত্যু বন্ধ হল বটে কিন্তু তাতে জীবের স্বরূপটি ফুটছে না। জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস এ স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না। কারণ দাস এই স্বরূপানুভূতি যদি জাগে তাহলে তার প্রাপ্তি হবে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সেবাসুখ। এই সেবাসুখ যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ তার স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না সুতরাং আসল মুক্তি লাভ হচ্ছে না। তাই সর্ব্বশাস্ত্র সার শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র মুক্তির একটি পরিপাটি লক্ষণ করলেন—

মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।

মুক্তির আসল পরিচয় হল অন্যথারূপ অর্থাৎ ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত পিতা মাতা এ সব ত্যাগ ক'রে জীব যখন নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস ব'লে মনে করতে পারবে তখনই তার প্রকৃত মুক্তিলাভ। জন্ম মৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তিলাভে স্বরূপ ফোটে না ব'লে ভক্তি পাওয়ার জন্য লোভও জাগে না—এই খানেই জন্ম মৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তির ত্রুটি। শুদ্ধ ভক্ত এই জন্য কোথাও মুক্তি প্রার্থনা তো করেই না বরং মুক্তিকে নরকের মত ঘৃণ্য ব'লে মনে করে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—

যে হৃদয়ে ভূমি মুক্তি বাসনা ধৃষ্টা চণ্ডালিনী থাকে সে হৃদয়ে শুদ্ধা, সাধ্বী ব্রাহ্মণী ভক্তি দেবী কখনও যান না। তার শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না।

ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে
ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক
এই ত্রিতাপজ্বালা যায় রে দূরে
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে
সকল মঙ্গল উদয় করে

মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তনে
শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে
যত বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তি ,,
শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়
সর্ব্বসাধন শক্তি দিয়ে
সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে
প্রেমামৃত সিঞ্চন করে
ভাবভূষণে ভূষিত করে
কম্প অশ্রু পুলকাদি
এই দেহাভিমান যায় রে দূরে
দারুণ সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি করায়
ব্রজে গোপী দেহ দিয়ে
নামের স্বরূপ গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি
এই তো নাম সংকীর্ত্তনের ফলশ্রুতি
নিতাই গৌরাঙ্গ আমার করুণাসিন্ধু অবতার—
নিজগুণে গাঁথি নাম চিন্তামণি
জগজনে পরাওল হার।

শ্রীপাদ আর্ত্তিভরে বলেছেন—
আমরি কি করুণা রে
করুণার বালাই লয়ে মরে যাই
আপনি যেচে বলে দিছেন
আপনার প্রাপ্তির উপায়
আরে কলি তিমিরাকুল অখিল লোক পেখি
বদন চাঁদ পরকাশ।

মহাজনী পদ আছে—

কলিঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম গেল দূর রে।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
(আমার) গোরা বড় দয়ার ঠাকুর রে॥

হরি বলে কেঁদে কাঁদাইয়ে
গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে
সকল তাপ দূর করলেন
নরনারীর কিবা কথা
বনের পশু কেঁদে লুটায়
গৌরমুখোদ্গীর্ণ নামের রোলে

সিংহ ব্যাঘ্র কেন কাঁদে তার রহস্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করছেন—

এস অনুভব করি ভাই রে
গৌরাঙ্গ নিগূঢ় লীলা
আমার মনে এই জাগিছে
শ্রীগুরুদেবের প্রেরণায়
জীবের স্বরূপ জগাতে এসেছে
এই স্বরূপ জগাতে এসেছে
হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব
জীব নিত্য রাধাদাসী
আজ স্বরূপ জেগে উঠেছে
পশু আবরণ ঘুচে গেছে
স্বরূপ জাগান স্বরূপ দেখে
স্বরূপ জাগান স্বরূপ
মধুর গৌরাঙ্গরূপ
(আজ তাদের) রাধাদাসী স্বভাব জেগে উঠেছে

চিনিতে পেরেছে
প্রাণগৌরের বাঁকা আঁখি দেখে
এ তো বটে প্রাণের রাধারমণ
দেখি জোড়া ভুরু বাঁকা নয়ন
কেন হেরি গৌরবরণ
হয়েছে মনে হয়েছে
শ্রীরাধার প্রেমঋণে ঋণী হয়েছে
ঋণ শুধিতে এসেছে
তাই তার ভাবকান্তি অঙ্গীকরি
এই অনুভবে কাঁদছে তারা
আয় আয় দেখে যাগো ও কিশোরী
তোর প্রেমের দায়ে বঁধু হল দণ্ডধারী
সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়
ঝারিখণ্ড পথে গৌর যায়
জগজনতাপ বিনাশ রে।

ঝারিখণ্ড পথে গৌর যাচ্ছেন সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটাচ্ছে—এ কথা মহাজনও বলেছেন। চিত্রকর শিল্পী চিত্রপটেও এঁকেছেন, কিন্তু তারা গৌর দেখে কেন কাঁদছে এ রহস্যটি শ্রীল বাবাজী মহারাজ ছাড়া আর কেউ এমন করে অনুভব করেছেন কিনা এ খবর তো জানা যায় না। গৌরসুন্দরের কলিজীবের প্রতি এই করুণার দিকটি শ্রীপাদের আস্বাদনে অভিনব। অনাদিকালের দুর্ব্বাসনা মালিন্য, দারুণ দেহাভিমান, যার ফলে জীবের এই সংসারে গতাগতি বাঁধা হয়ে আছে, সেটি যে গৌরসুন্দরের করুণাভরা নয়নের বারেক দৃষ্টিতে চিরতরে দূর হ'তে পারে—এ করুণার উচ্ছলনের কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই—শ্রীপাদ সেই দিকটি দেখালেন।

শ্রীপাদ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই মহামন্ত্র সম্বন্ধে আরও বললেন—

মহামন্ত্র মহাশূর
যে ধনের পায় নাই সন্ধান
কর্ম, যোগ, জ্ঞান সাধন ফলে
তাই অনায়াসে করেন দান
মহামন্ত্র মহাশূর
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন
সবাই শক্তিহীন নামের কাছে
অপরূপ এই নামরহস্য
যখন দেখলেন লীলা থাকেন না
কিশোরীর দশমী দশাতে
তখন এই নাম হলেন প্রকাশ
ব্রজলীলা রাখবার লাগি
কৃষ্ণবিরহিনী কিশোরীর শ্রীমুখ হতে
যেই এই নাম শুনলেন
বিরহিনী রাই কিশোরী
সঙ্গে সঙ্গে বিরহের শান্তি

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্রের প্রথম 'হরে' নাম স্ফুরণে বিরহিনী কিশোরী শুনে মনে করলেন—

ঐ বাঁশী বাজে কদম বনে
ব্রজ ছেড়ে কোথায় যান নি
সঙ্গে সঙ্গে বিরহের শান্তি
প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায়
পর পর লীলা ভোগ
পর পর নাম স্ফুরণে
শেষ 'হরে' মহারাস দেখায়

ব্রজলীলারসধাম

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যদি মহামন্ত্র 'হরেকৃষ্ণ' নাম কিশোরী শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমুখ থেকেই প্রথম প্রকাশ পেয়ে থাকেন তাহলে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কেন এই মহামন্ত্রকে শ্রীচৈতন্যমুখোদ্‌গীর্ণ ব'লে উল্লেখ করলেন ?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ এ রহস্য শ্রীগুরুকৃপায় উন্ঘাটন করেছেন। ব্রজবিহারী শ্রীনন্দনন্দন স্বমাধুরী আস্বাদন করতে রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার ক'রে গৌরহরি নাম ধরেছেন। গম্ভীরা ভিতরে যখন মহাভাবনিধি গৌরাঙ্গসুন্দর তখন দশমী দশায় সদাই বিভোর হয়ে থাকেন। সেই অবস্থায় কাঁদেন এবং নিরন্তর এই 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করেন। এই বিরহেই তাঁর পরিপূর্ণ ভোগ। প্রাণগৌর-রহস্য অনুভবী শ্রীল কবিরাজ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রকে তাই শ্রীচৈতন্য শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ ব'লে উল্লেখ করলেন। এ নাম তাই যুগল বিলাস ধাম। ব্রজলীলারসের উপাদান এই নামেই করেন অবস্থান। ব্রজলীলারস এই নামেই পূর্ণ আছে। যদি কারও প্রাণে সাধ হয় রাধাকৃষ্ণ যুগল উজ্জ্বল বিহার ভোগ ক'রব তাহলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে তাকে এই মহামন্ত্র নামের আশ্রয় নিতে হবে—এই নামই সব ভোগ করাবে।

যুগল সেবামৃত সমুদ্রে ডুবায়

মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন

পরাণ গৌরাঙ্গ দেখায়

দেখায় মধুর গৌরদেহ

নিত্যমিলনে নিত্য বিরহ

দেখায় চিতচোরা গোরা

'হরেকৃষ্ণ' নাম নিজ স্বরূপ

গৌর অনুরাগীর বুক ভরা

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে করি কলিযুগোচিত সাধন শ্রীনাম সংকীর্ত্তন, তাই যুগাবতার শ্রীগৌরহরি সেই যুগধর্ম কলিজীবকে উপদেশ ক'রে তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছেন। এ শুধু যুগধর্ম প্রচার নয়—এর মধ্যে কলিজীবের প্রতি তাঁর যে কতখানি করুণার প্রকাশ, সেই দিকটি শ্রীল বাবাজী মহারাজ দেখালেন। শ্রীগৌরসুন্দর কলিজীবের প্রতি অসীম করুণায় অযাচিত কৃপাকারী নিজেকে পাওয়ার উপায়টি কলিজীবকে দান করলেন। এই নামাশ্রয়েই কলিজীব গৌর স্বরূপটি অনুভব করতে পারবে। নিজেকে জানাবার উপায়টি দেখিয়ে গেলেন—এ করুণার তুলনা হয় না। শ্রীপাদের এ রহস্য প্রকাশও অতুলনীয়।

'হরেকৃষ্ণ' নাম মালার স্বরূপও শ্রীপাদ কীর্ত্তনের মাধ্যমে দেখালেন—

অষ্টোত্তর শতমালার রহস্য
মালার ঝোলা রাসস্থলী

শ্রীপাদ নিজের অনুভবটি কীর্ত্তনের মাধ্যমে ধ'রে দিয়েছেন—

এ তো বলবার কথা নয় ভাই
কেবল অনুভবের ধন
নাম মালার মাঝে সকলেই আছে
মাঝে আছে সুমেরু
জড়াজড়ি কিশোরী কিশোর
সুমেরু যুগোলকিশোর ঘিরে
চারিদিকে নামের মালা
নামের মালা ব্রজবালা
যুগল প্রেমসূত্রে বাঁধা সবে
গ্রন্থিরূপে চিকণ কালা
মাঝে মাঝে বিহরই
শ্রীগুরুকৃপায় দেখে

শ্রীগুরু অনুগত সাধক
মালাই তো রাস বটে
দেখে মূরতিমন্ত নাম মালা
দেখতে দেখতে কিছু দেখে না
কোন মূরতি দেখতে পায় না
রাধাকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলী
দেখে অপরূপ এক গৌরবর্ণ
কোন মূরতি দেখা যায় না
সেই গৌরবর্ণের প্রভাবেতে
তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
মূরতি দেখবার তরে
কিছু পরে দেখতে পায়
শ্রীগুরুকৃপায়
আবির্ভাব এক নব মূরতি
যা ব্রজে কখনও দেখে নাই
নব গৌরবর্ণঘন
মাখামাখি পুরুষ প্রকৃতি
রাই-এর বরণ শ্যামের গঠন
রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি আকৃতি
স্বর্ণ পুত্তলিকা ঢাকা নীলমণি
সে যে আমার গৌর মূরতি
দেখে আবির্ভাব এক সোনার মূরতি
রসবতী ঢাকা রসভূপতি
দেখে প্রাণের গৌরহরি
'হরেকৃষ্ণ' নামের স্বরূপ
দেখে প্রাণের শচীসুত
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য

দেখে প্রাণের নন্দের নিমাই
পরস্পর বুকে ধ'রে হারাই হারাই
দেখে চিতচোরা গোরা
পরস্পর বুকে ধ'রে আত্মহারা
শুধু কেবল তাই নয়
দেখে বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা
রাই কানু কানু রাই
রমণী রমণ রমণ রমণী
কিশোরী কিশোর কিশোর কিশোরী
মহাভাব রসরাজ রসরাজ মহাভাব
দেখে নিগম নিগূঢ় গৌররূপ
বিলাস বিবর্ত্ত রূপ
গৌর মূরতি দেখেই
ব্রজ দেখে নদীয়া
শ্রীযমুনা সুরধনী
শ্রীরাসমণ্ডল শ্রীবাস অঙ্গন
তার মাঝে নাচে শচীনন্দন
পারিষদ সব গোপীগণ
চারিদিকে ঘিরে নাচে
গৌর পরিকর যত
গৌর পরিকর যত
সখাসখী মিলিত
এ যে আশমিটান লীলা রে
নামই সব বলে দেবে
একান্ত নাম আশ্রয় করলে
শ্রীপাদ জগজ্জীবের কল্যাণে আর্ত্তিভরে বললেন—
আয় প্রাণভরে গান করি

হৃদে ধরি শ্রীগুরু মূরতি

হৃদে ধরি শ্রীগুরু মূরতি

আমাদের জীবনে মরনে গতি

আয় প্রাণভরে গান করি

নিতাই গৌরাঙ্গ বিলাস ভোগে মাতি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম

আমরি কি মধুর নাম

নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত

অমৃত হতেও পরামৃত

কত সাধের গাঁথা নাম

পরাইলেন নামের মালা

ঘুচাইতে মোদের প্রাণের জ্বালা

শ্রীগুরু মহারাজ আমাদের কক্ষায় দাঁড়িয়ে আক্ষেপ ক'রে বলছেন—

(কিন্তু) ঘুচল না আমাদের জ্বালা

নামের মালা পরতে নারলাম

নামাশ্রয় করতে নারলাম

স্বতন্ত্রতা গেল না

কেবল কলঙ্ক রটালাম

তার সম্বন্ধ ধরি ব'লে

ঘুচাও ঘুচাও কালিমা ঘুচাও

নামে অনুরাগ দাও

প্রাণভরে গান করি

শ্রীগুরুদেব তোমায় হৃদে ধরি

শ্রীগুরু মহারাজের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ ক'রে যেন প্রাণ ভ'রে তাঁর দেওয়া নাম গাইতে পারি—এইটিই সাধুবৈষ্ণব শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

সকলের বাসনা পূরণ

গৌর নাগর

সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল গৌরের সংকীর্ত্তন মহারাসে—

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে সকলের সাধই পূর্ণ হয়েছে। ব্রজের কৃষ্ণ নদীয়ার গৌর হয়েছেন। অপূর্ণ সাধ পূরাইতে। শ্রীগোবিন্দ রসরাজ স্বরূপেও রসের অপূর্ণতা—তাই সেই সাধ পূরণের জন্য তাঁকে গৌর হ'তে হল। কেমন ক'রে শ্রীগোবিন্দ গৌর হলেন তাঁর বাসনার খবর শ্রীপাদের কীর্ত্তন প্রসঙ্গে আমরা দেখলাম। কিন্তু গৌর এমনই এক স্বরূপ যে স্বরূপে সকলের সাধ পূর্ণ হয়েছে। সখা সখী মিলিত প্রতিটি গৌর পরিকর তাই গৌর পরিকররূপে ব্রজের সখা সখীরও বাসনা পূর্ণ হ'ল। শ্যামসুন্দর রাধাভাব কান্তি ধ'রে রাধারাণীর প্রেমকে গুরু ক'রে স্বমাধুরী আস্বাদন করলেন। কিন্তু শ্যামমনোমোহিনী শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর স্বরূপে কি কোন বাসনা ছিল না? শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনের মাধ্যমে বললেন আমাদের কিশোরীর মনেও সাধ ছিল—

নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে॥

ব্রজে কৃষ্ণ সঙ্গে মিলনের পক্ষে রাধারাণীর অনেক বাধা গুরুজনের ভয়, বাদিনীর ভয়। তাই রাধারাণীর মনে হয়—

যদি পুরুষাকৃতি পেতাম
সদাই তোমা ল'য়ে ফিরতাম

রাধারাণীর মনে হ'ত—

মণি নও মাণিক নও আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশে।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে॥

ব্রজে কৃষ্ণ সঙ্গে মিলনের পক্ষে রাধারাণীর অনেক বাধা গুরুজনের ভয়, বাদিনীর ভয়। তাই রাধারাণীর মনে হয়—

যদি পুরুষাকৃতি পেতাম
সদাই তোমা ল'য়ে ফিরতাম

রাধারাণীর মনে হ'ত—

মণি নও মাণিক নও আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশে।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে ॥
অগুরু চন্দন হইতাম তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ বামন হ'য়ে চাঁদে হাত
বিধি কি সাধ পুরাবে আমার ॥

রাধারাণীর মনে কত সাধ—

যদি শীতল বাতাস হতাম
সঙ্গে সঙ্গে ব'য়ে যেতাম
বঁধুর পথশ্রম তাতে দূর হত

আবার শীতল ছায়া হ'য়ে যদি তার তৃপ্তি সাধন করতে পারতাম। কিন্তু ব্রজে সে সাধ তো পূর্ণ হয় নি। আজ গৌরস্বরূপে সে সাধ মিটল। শ্রীপাদ কীর্ত্তনে আস্বাদন করছেন—

আজ সেই সাধ মিটিল
রসময়ের গঠন পেয়ে
আগে নাম লইতে ছিল বাধা
ফুকারিয়ে শ্যামসুন্দর
আগে কাল দেখতে বাধা ছিল
এবার সব বাধা মিটিল
দেশে দেশে ফিরে গো

পরাণ বঁধু বুকে ধ'রে

সবাই বলে গৌরহরি

শচী দুলালে হেরি

তাতো নয় তাতো নয়

ওযে আমাদের প্রাণ কিশোরী

ফিরছে বঁধুকে বুকে ধ'রি

ব্রজলীলায় রাধারাণীর প্রাণে বড় দুঃখ ছিল। গুরুজনের ভয়ে বাদিনীর ভয়ে বঁধুর সঙ্গে মিলনে বড় বাধা ছিল। তাই বিরহ ভোগ করতে হয়েছে। যে বিরহকালে এক্ক্ষণ কালকে যুগসম মনে হ'ত। কিন্তু সেই রাধা আলিঙ্গিত কৃষ্ণই তো এখন গৌর। তাই গৌরস্বরূপে তো কোন বাধা নেই। নিরন্তর বঁধুকে বুকে ধ'রে বেড়াচ্ছে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনে অক্ষর দিলেন—

ফিরছে বঁধুকে বুকে ধ'রি

বঁধুর বিরহ সইতে নারি

আর কেউ লখিতে নারছে

আজ বড় সাধে বেড়াইছে

বুকে রেখে উপরে থেকে

অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর

গৌরস্বরূপে তাই যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল। আবার বলদেবেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল। বলাই তো দাদা তাই রাস-ভোগে বাধা ছিল—কারণ সম্বন্ধের বাধা অথচ বলদেবের সেবাতেই তো যুগল বাঁধা আছেন।

সকলই তো বলাই আমার

বসন ভূষণ ভোজ্য পেয়

যোগপীঠ বলাই আমার

পুষ্পশয্যা বলাই আমার

এদিকে কোন বাধা নেই

কেবল সম্বন্ধে বাধা

বলরামেরও ইচ্ছা হ'ল

রাসভোগ করব

কি ক'রে সাধ পূর্ণ হবে

মনে মনে ভাবিল

অনঙ্গমঞ্জরী আমারই তো স্বরূপ বটে কারণ অনঙ্গমঞ্জরী তো যুগল কিশোরের অন্তরঙ্গ সেবা করে। তাই সেই অনঙ্গ মঞ্জরীতে প্রবেশ ক'রে বলাই এর সাধ পূর্ণ হ'ল

শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে

অনঙ্গের ভাব কান্তি নিল

এতে অনঙ্গের বাসনাও পূর্ণ হ'ল

সখী আর মঞ্জরীরগণ যত সবাই কিশোরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মূর্ত্তিমন্ত কারণ কিশোরীমণির এক দেহে গোবিন্দ সেবা ক'রে তো আশ মেটে না তাই মনে হয় যদি আমার প্রতি অঙ্গ দেহ হ'ত—

যদি প্রতি অঙ্গ দেহ হ'য়ে সেবা দিত তবে আমার আশা মিটিত। তখন যোগমায়া লীলাশক্তি রাই-এর প্রতি অঙ্গের মূর্ত্তি করলেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও সেই বাসনা

স্বরূপের যেই বাসনা

তারাও পুরুষ দেহ চায়

শ্রীরাধিকার আনুগত্যে

বলরামের গঠন পেল

অনঙ্গের বাসনা পূর্ণ হ'ল

এইরূপে গৌরপরিকর স্বরূপেতে সখা আর সখীগণের বাসনা পূর্ণ হইল।

শ্যামসুন্দরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তো সখাগণ। তারা সখীগণের ভাব চায়। আর সখী মঞ্জরীরা পুরুষ দেহ চায়।

দুইএর আশা মিটিল

তারাই তারাই মিলিল

যে অঙ্গের সঙ্গে যে অঙ্গের সম্বন্ধ, যে অঙ্গে যে অঙ্গ লুব্ধ।

যে অঙ্গে যে অঙ্গ লুব্ধ

প্রাণ রাধা রাধারমণের

কৃষ্ণ অঙ্গের সেই সখা

রাধা অঙ্গের সেই সখী

তারাই তারাই মিলিল

লুব্ধ অঙ্গের সখা সখীরা মিলিল তাই উভয়ের সাধ পূর্ণ হ'ল। সখাগণ সখীর ভাবকান্তি পেল, রাসে অধিকারী হ'ল।

উজ্জ্বল রস আস্বাদিল

ব্রজের যত সখাগণ

সখীগণের আশা পূর্ণ হ'ল

সখার স্বরূপ পেল

তাই আর কেউ চিনতে পারে না—তাই যমুনার তীরে ল'য়ে নন্দলালা ঐ ব্রজের ব্রজবালা এ আর কেউ বলে না।

বাদী তাই নিরস্ত হয়েছে। রাইকানু মিলিত গৌর সনে এখন পরিকররূপে স্বচ্ছন্দে বিহরিছে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করছেন—

মধুর গৌরাঙ্গ লীলা—

যুগলে যুগলে খেলা

যুগলে যুগলে খেলা

গৌর যুগল পরিকর যুগল

গৌর আমার পূর্ণ যুগল

পরিকর কায়ব্যূহ যুগল

যুগলে যুগলে খেলা

যুগল বিষয় যুগল আশ্রয়

শ্রীগুরু অনুগত সাধক দেখে

রাইকানু মিলিত গৌরাঙ্গে

সবে ঘিরে ঘিরে নাচিছে

পারিষদ বেশে সখাসখী

পারিষদ বেশে সখা সখী

তাদের দেখতে পুরুষ ভাব প্রকৃতি,

সবে ঘিরে ঘিরে নাচিছে

সংকীর্ত্তন রাস রঙ্গে

অপরূপ গৌরাঙ্গ লীলায় মদনমোহনের নিত্যত্ব। রাধা সঙ্গে যতক্ষণ কৃষ্ণ ততক্ষণই তো তিনি মদনমোহন কিন্তু রাধা ছাড়া শ্যাম শুধুই মদন। তাই ব্রজে মদনমোহনের নিত্যত্ব নেই। কারণ ব্রজে কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ কিন্তু নবদ্বীপে মদনমোহনের নিত্যত্ব কারণ রাধা সঙ্গে সদা মিলিত।

হয় নিত্য মদনমোহন

রাইকানু মিলিত শচীনন্দন

গৌর নিত্য মদনমোহন

মদনমোহনের মদনমোহন

নাগরালির পূর্ণত্ব

তাই শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে

যাকে দেখলে সবাই প্রাণবল্লভ বলে তারেই তো নাগর বলে। যখন একলা পুরুষ আর সকলই আলি তখনই পূর্ণ নাগরালি।

ব্রজে পূর্ণ হয় নাই ভাই

শ্যামসুন্দরের নাগরালি

কতক গোপী পেয়েছিল।

গৌর স্বরূপে নাগরালির পূর্ণত্ব

বৃন্দাবনের রাসলীলা

কেউ তো রাস পায় নাই

ব্রজে পুরুষ দেহধারী

বরজ যুবতী মাঝেও বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যাদের তারাও বাদ পড়েছিল। সম্বন্ধ মর্য্যাদা হিসাবে তাদের বাধা।

ব্রজে পেল রাসলীলা

বাছা বাছা ব্রজবালা

এবার নবদ্বীপ লীলায় গৌরাঙ্গ স্বরূপে নাগরালির পূর্ণত্ব।

এবার নাগরালির পূর্ণত্ব

সংকীর্ত্তন রাসরঙ্গে

গৌরহরি রাস করে

সবার স্বরূপ প্রকট ক'রে

এখানে গৌরের স্বরূপের প্রভাবে জগজীবের গোপীভাব জেগে উঠেছে—ইচ্ছা ক'রে জাগাতে হয় না।

সেই গোপীভাবে মেতে যায়

যে দেখে গোরা রায়

সবারে কৈল রাধাদাসী

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের হাসি,

পদকর্ত্তা শ্রীল নরহরি দাস বললেন—

গৌর গমন গৌর গঠন

গৌর মুখের হাসি।

গৌর বচন অমিয়া সিঞ্চন

মরমে রহল পশি॥

পদকর্ত্তা একথা বল্লেন বটে কিন্তু গৌরমুখের হাসির যে কি প্রভাব, তার যে জগতে কি অনবদ্য দান শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সেটি প্রকাশ

করলেন। গৌরমুখের হাসি সবাইকে রাধাদাসী করেছে অর্থাৎ জীবের স্বরূপ জাগিয়ে দিয়েছে। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, জীব নিত্য রাধাদাসী—এইটিই জীবের খাঁটি স্বরূপ। যে স্বরূপ ভুলে জীবের এই দুর্গতি—যেটি দারুণ সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ। যার ফলে মায়ার লাথি জীবকে ভোগ করতে হ'চ্ছে অহরহ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

গৌর মুখের হাসির ফলে জীব তার স্বভাবে ফিরে এসেছে—এই রাধাদাসী স্বরূপে গৌর দেখেই তাকে সবাই বলে প্রাণবল্লভ। জীব নিজ বাহ্য স্বরূপ ভুলে গিয়ে সবাই বলে প্রাণবল্লভ। নরনারীর কিবা কথা, পুরুষদেহধারীর কিবা কথা। স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা আদি করি সবাই হৈল গোপনারী।

বনের পশু গোপী হ'ল
সবাই গোপীভাবে মাতা

স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা
সবার আবরণ ঘুচে গেল
স্বরূপ জাগিয়া উঠিল
যে আবরণে থাকুক না কেন
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ
জীবের স্বরূপ নিত্য রাধাদাসী
আজ জেগে উঠল সেই স্বরূপ
দেখে আমার গৌর রূপ,

তাই ঝারিখণ্ড পথে গৌর দেখে সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়। স্বরূপ জাগান স্বরূপ গোরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীর স্বরূপ জাগাতে এসেছে।

স্বরূপ জাগাতে এসেছে

শ্রীরাধাভাবে আপনি মেতে
বিহরে গোরা বনমালী
সবারে ক'রে বরজ আলি
বিলাসী গোরা সুখে বিলসে
সংকীর্ত্তন মহারাসে

স্থাবর জঙ্গম গোপী ক'রে রাস করে আমার প্রাণ গোরা রায়।

গৌরাঙ্গ স্বরূপে জগন্নাথ নাম পূর্ণ হ'ল। একলা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি, গৌরাঙ্গ স্বরূপে সে কথা সার্থক হ'ল।

নিরপেক্ষ শক্তি যিনি তিনিই পুরুষপদ বাচ্য—
সেই তো নন্দদুলাল বটে
একমাত্র পুরুষ জগতে,
কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়
পুরুষশব্দ বাচ্য হয়,
জগভরি সব শক্তি
এক কৃষ্ণ শক্তিমান,
সকলেই প্রকৃতি সত্তা

শ্রীভাগবতে এই তত্ত্বের প্রকাশ—গৌরাঙ্গ স্বরূপে সার্থক হ'ল।

গৌর বিলসিল সবাসঙ্গে
গোপীভাব জাগায়ে দিয়ে
সংকীর্ত্তন রাস রঙ্গে
দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গনে
আনের কথা কিবা বলব
নাগরে করিল আলী
এমনই মধুর গৌরের নাগরালী

এর নিদর্শন শ্রীল বাবাজী মহারাজ রথাগ্রে গৌরের নটন কীর্ত্তন রঙ্গে আস্বাদন করেছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বন্দনা গাইলেন—

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হচ্ছেন যিনি মধুর শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের আগে নৃত্য করেন। যে নটনমাধুরী দর্শনে জগৎ মুগ্ধ হ'য়েছে এ তো সামান্য কথা, যে গৌর নটনমাধুরী দর্শন ক'রে জগন্নাথ নিজে বিস্মিত হয়েছেন।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রাণের আস্বাদন—

কিশোরী আবেশে আমার শ্রীশচীনন্দন।
স্বরূপ রামানন্দে বলেন মধুর বচন॥
বলে ও-ললিতে ও-বিশাখে
স্বরূপ রামরায়ের কর ধ'রি
চল সখি ত্বরা করি
আজ ব্রজে বিজয়ী শ্যামনাগর
বলে দেখ দেখ প্রাণসখি
হেলে দুলে আসছে
রথোপরি বংশীধারী
ভাবাবেশে গৌর নাচে
কিশোরী আবেশে ভোরা
ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার
গৌর নাচে রাধাভাবে
শ্রীজগন্নাথের রথের আগে
রথযাত্রায় নীলাচলে আনন্দের আর সীমা নাই।
সাজলো গৌরগণ সব গোপনারী
পরিকরঘেরা গৌরহরি
যেন সহচরীমাঝে ভানুদুলারী

করে লীলা গৌরহরি
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া।
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন করয়ে গোরারায়॥
সবাই আনন্দে নাচে গায়
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়
নেচে নেচে নেচে যায়
প্রেমদিঠে জগন্নাথ বদন চায়
ভাব অনুকুল গান গায়
যত পরিকর মেলি
ভাবনিধি গোরা রায়ের

জগন্নাথের বদন পানে চেয়ে আবেশে গৌরসুন্দর বলছেন,—

এই তো সেই পরাণ বঁধু
যার লাগি সদা ঘুরে মরি,
গৌর নাচে হেলে দুলে
আজানুলম্বিত বাহু তুলি
ঘন ঘন হরি হরি বলি
নাচে গৌরকিশোরী
জগন্নাথের রথের আগে,
হ'ল চৌদ্দভুবন আকর্ষিত
গৌরমুখোদ্গীর্ণ নামের রোলে,
প্রাণপণে প্রাণ টানিল
নামের ধ্বনি পশিয়া কানে,
গৌরমুখোদ্গীর্ণ নাম শুনে
সকলই হইল নামময়
অন্যকথা কেহ না কয়
আছে নিতাই কাছে কাছে

ভাবাবেশে গৌর নাচে
তাই নিতাই নাচে কাছে কাছে
প্রাণগৌর ঢ'লে পড়ে পাছে
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
কিশোর হয়েছে কিশোরী
আজ জগন্নাথের বদন হেরি,

গৌরপরিকর গোবিন্দ, মাধব, বাসু ঘোষ, বসু রামানন্দ, নরহরি' গদাধরপণ্ডিত প্রভৃতি গৌরের এই নবমাধুরী আস্বাদন করছেন।

আজ রাইজড়িত স্বরূপ গৌর দেখে জগন্নাথ হল মুগ্ধ। ভাবনিধি প্রাণগৌর আমার আজ নিজগণে নাচাইয়া—

আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥

আপনি না নাচিলে কি নাচানো যায়, তবে কেমন ক'রে নাচাইল।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ গৌর অনুভবী দরদ দিয়ে প্রাণভরে আস্বাদন করছেন—

ভিতরে ভিতরে নেচেছে গোরা
প্রতি প্রাণে নেচেছে গোরা
তারা সবাই নেচেছে।

গৌর নাগর—রথে আস্বাদন

নাটুয়া গৌর হৃদে ধ'রে

বাহিরে নাচিতে সাধ হয়েছে

ভিতরে নাচি নাচাইয়া

জগৎ নাচাবে ব'লে গৌরের

সবপরিকর মেলি মনসাধে নাচবে ব'লে সাত সম্প্রদায় একত্র কৈল।

আবেশে নাচে গোরারায়

আলাত চক্রের প্রায়,

কতরূপে করিছে দান

কীর্ত্তন নটন রঙ্গে

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রেমে ভাসে

কীর্ত্তন নটন রঙ্গে

গৌর অঙ্গে হ'ল প্রকট

মহাভাবাবলি যত

স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে।

কখনও তো দেখে নাই

জড়াজড়ি নটন মাধুরী

ব্রজে কৃষ্ণ নেচেছেন রাধারাণী দেখেছেন, আবার—রাধারাণী নেচেছেন কৃষ্ণ দেখেছেন। রাধাকৃষ্ণ একসঙ্গে নেচেছেন, তখন সখীরা দেখেছেন। কিন্তু দুজনের নাচ তো কৃষ্ণ কখনও দেখেন নি। আজ সেই কৃষ্ণ জগন্নাথ গৌর নটন মাধুরীতে যুগলের নৃত্য দর্শন করছেন। তাই—

তা হ'তেও দেখে অধিক মাধুরী

ব্রজনিকুঞ্জে যা দেখেছিল

সেখানে দুজনে স্বভাবে ছিল

এবে দুজনের স্বভাব হারাইল

এখানে যে বিপরীত রীতি

নাগরী নাগর নাগর নাগরী

গৌর নাগর আজ নাগরী ভাবে নাচছেন—

নিভৃতে রাই ঢাকা আছে কানাই

বুকে ধ'রে আছে কিশোরী

তবু বলে কোথা বংশধারী

তাই এখানে স্বভাব হারিয়েছে—

জগন্নাথ বিমোহিত

হেরি ভাবে ভোরা শচীসুত

রথী যে অচল হ'ল

স্বরূপে অচল ভাবেত অচল তাই আর তো রথ চলে না।

যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ তবে কেন মুগ্ধ হয়।

জগন্নাথ নন্দনন্দন কিন্তু কত মধুর নিজ মাধুরী কখনও তো দেখে নাই।

রাধাসঙ্গে আপনার মিলিত স্বরূপ গৌর দেখে তাই মুগ্ধ। আপন গৌর লীলা রহস্যে জগন্নাথ ডুবে গেল। রথী যে অচল হল। গৌর নটন মাধুরী দেখে, জগন্নাথ রথী আর চলতে পারে না। রথী অচল হলে রথও আর চলতে পারে না।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ গাইছেন—

আজ জগন্নাথ আত্মহারা

দেখি ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা

আজ জগন্নাথ বিমোহিত

দেখি রাইকানু একীভূত

আজ মুগ্ধ জগন্নাথ

দেখি নিজরূপ রাধাসাথ

কেন গৌর দেখে জগন্নাথের এত বিস্ময় ? শ্রীল বাবাজী মহারাজ কারণ দেখলেন—

জগন্নাথ একলা, গৌরযুগল তাইতে জগন্নাথ মুগ্ধ। শ্রীধাম বৃন্দাবনে পণ রেখে নাচ হয়েছে। গোবিন্দ যখন নেচেছেন রাধারাণী দর্শন করেছেন আবার রাধারাণী যখন নেচেছেন গোবিন্দ দেখেছেন। যুগলে যখন নৃত্য করলেন তখন সখীরা দেখছেন—আস্বাদন করছেন। কিন্তু যুগলের নাচ তো কৃষ্ণ দেখেন নি। কারণ নিজের নাচ তো নিজে দেখা যায় না। তাই জগন্নাথ আজ গৌর স্বরূপে যুগলের নৃত্য দেখে এত মুগ্ধ। শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল রাধারমণের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন ক'রে শ্রীগুরুকৃপা ভোগ ক'রে বললেন—

শ্রীগুরুদেব কৃপা করে জানালেন

সচল অচলের খেলা,
দুজনে দুজনায় ভোগ করে
রাধাভাবে গোরা দেখে জগন্নাথে বংশীধারী।
গৌরাঙ্গে জগন্নাথ হেরে যুগল মাধুরী॥
আস্বাদিছে স্বমাধুরী
দুই স্বরূপে বংশীধারী
জগন্নাথ আর গৌরহরি
দুই স্বরূপেই বংশীধারী
আস্বাদিছে আপন মাধুরী
রাধাভাবে ভোরা হরি
জগন্নাথের বদন হেরি
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধরি
জগন্নাথ বংশীধারী
আস্বাদিছে যুগলমাধুরী
আস্বাদিছে যুগলমাধুরী

গোরারসের বদন হেরি

এসেছে জগন্নাথ রূপ ধরি

শ্রীনন্দনন্দন বংশীধারী

আস্বাদিতে গৌর যুগলমাধুরী

গৌরস্বরূপে আস্বাদনের জন্য শ্যামসুন্দর জগন্নাথরূপে প্রকট হয়েছেন। জগন্নাথরূপে যখন ভোগ তখন যান নেচে নেচে।

আগে দাঁড়ায়ে নাচে গোরা

যুগলমাধুরী বিকাশ ক'রে

রথের আগে গৌর নেচে যায়

দেখি মুগ্ধ জগন্নাথ শ্যামরায়

দেখতে দেখতে জগন্নাথ

রাধা সঙ্গে মিলিত আপন মাধুরী

ধীরে ধীরে যায় রে

জগন্নাথ মুগ্ধ কিন্তু কিছু পরে ক্ষুব্ধ হলেন। কারণ রথযাত্রা শেষ হ'লে তো গৌর নয়নের আড়াল হবে। তাই আর তো দেখতে পাব না। তখন ক্ষুব্ধ হয়ে লুব্ধ হলেন। জগন্নাথের চিত্তে লোভ জাগল গৌরস্বরূপ নিরন্তর ভোগ করবার জন্য। কিন্তু সেটি কি ক'রে সম্ভব হবে?

লুব্ধ হ'য়ে মনে গণে

তখন পরিকরে দৃষ্টি পড়িল

তবে সাধ পূর্ণ হবে

গৌর পরিকর হব যবে,

রসরাজ্যের এই খেলা বটে, গৌর পরিকরত্বে জগন্নাথ লুব্ধ।

দিন দিন বাড়ছে

অবধি তো পাচ্ছে না

সুরাসুর নরে টানিল রথেরে

তবু না চলয়ে রথ।

পড়িছা পূজারী বেত্র হস্তে করি
গালি পাড়ে কত মত ॥
রাজার আদেশে জোড়ে দুইপাশে
শত শত করীবর।
টানে রথ বলে তথাপি না চলে
একপদ রথিবর ॥

শ্রীপাদ আস্বাদন করলেন—

কেমন ক'রে রথ চলিবে
রথী যে ভাবে অচল হ'ল,
রথীকে না চালালে
সেই তো চালাতে পারে
যে অচল করেছে তারে,
আর তারে কে চালাবে
গৌর না চালালে পরে
তবে গোরা রায় রথ পাছে যায়
শিরেতে ঠেলিতে রথ।
চল চল করি ত্বরা
প্রাণে প্রাণে বলে প্রাণগোরা,
পরাণ বঁধু আমার এই নিকুঞ্জ মাঝে
চল ব্রজ নিকুঞ্জে ফিরে চল
পথে এসে কেন দাঁড়ায়ে রইলে
আর তো বিলম্ব সয় না
তাইতে আজ রথ ঠেলে
শীঘ্র ব্রজে যাবে ব'লে
বায়ুর বেগেতে নিমেষের মাঝেতে
চলিল যোজন শত ॥
সবই শ্রীরাধার বল

শ্যামসুন্দরের যা কিছু বল,

তাইতে রথ চলিল

গৌরকিশোরীর পরশ পেল,

জয় গৌর বলি দুই বাহু তুলি

করে রোল যাত্রীগণ।

বলে জয় জয় গৌরহরি

অচলে সচলকারী

বলিহারি যাই গৌরাঙ্গের বল

অচলে করিল সচল

বংশীধারীর বদন দর্শন ক'রে, মহাভাবাবলী ভূষণেতে সেজে গৌরকিশোরী ভাবাবেশে নেচে নেচে যাচ্ছেন।

ভাবাবেশে গোরা রায় নাচিতে নাচিতে যায়

ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করছেন—

জগন্নাথ ধীরে চলে

গৌরমাধুরী পিয়ে পিয়ে,

গৌরমাধুরী ভোগে ভারী হ'য়ে

জগন্নাথের রথ যে চলতে চলতে আর চলে না থেমে যায়। তাতে শ্রীপাদের আস্বাদন—

রথ চলিল না মনে করো না

রথের রথী হল অচল

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা লোভনীয় লীলা কারণ পরিকরও লুব্ধ হল। মহাভাবনিধি প্রাণগোরা সপরিকর জগন্নাথের চিতচোরা। জগন্নাথের রথের আগে যখন গৌর নাচছেন তখন গৌরপরিকরগণও দেখছেন—

নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ সনাতন

কি দেখছেন রূপ সনাতন ?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ অনুভব ক'রে বললেন—

নাগরে নাগরী কৈল

শ্রীরাধাপ্রেমের কত বল

অবশেষে শ্রীগুণ্ডিচা দ্বারে রথ পোঁছুলে রথে শ্রীজগন্নাথ দর্শন ক'রে প্রেমস্বরে গৌরসুন্দর বলছেন—যেন ব্রজে পেয়েছেন প্রাণবঁধুকে অনেকদিন পরে—

প্রেমস্বরে বলে গোরা

ব্রজে কৃষ্ণ পেলাম মেনে

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে।

দেখা না হইত পরাণ গেলে॥

সকল দুঃখ দূরে গেল

পরাণবঁধু ঘরে এল,

আমার ব্রজের জীবন ব্রজে এল

জগন্নাথের আগে দাঁড়াইয়ে স্বরূপ রামরায়ের করে ধ'রে বলে—

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

ব্রজের কুঞ্জে কুঞ্জবিহারী এসেছেন তাই গৌরকিশোরী নিজ পরিকর নিয়ে মঙ্গল আচরণ করলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলছেন—

ও ললিতে ও বিশাখে

সবে কর মঙ্গল আচরণ

দাঁড়াও সবে সারি সারি

ব্রজমঙ্গল ব্রজে এল

কুঞ্জে আইল কুঞ্জবিহারী

মধুর গৌরাঙ্গলীলা

রথযাত্রায় নীলাচলে

শ্রীল বাবাজী মহারাজের হৃদয় আক্ষেপে ভরা। যখন শ্রীগৌর

সুন্দরের প্রকট বিহার তখন তো জন্ম হয়নি। তাই স্থাবর জঙ্গম প্রেমোন্মত্তকারী লীলা দেখতে তো পাইনি। প্রাণগৌরাঙ্গের পাষাণ গলান লীলা দেখতে তো পাইনি। লীলা অদর্শন শেল, নিশিদিশি জ্বলছে হিয়া, শ্রীরথযাত্রায় মধুর বিহার দেখব ব'লে বড় সাধে এসেছি। ভক্ত সম্মেলনে, ঝালি সমর্পণে, শ্রীগুণ্ডিচামার্জনে, শ্রীরথযাত্রায় গৌর মাধুরী দেখব বলে প্রাণে বড় সাধ কিন্তু দেখতে তো পেলাম না।

ভক্তিরস আস্বাদনের এইটিই স্বভাব যার যত আস্বাদন তার তত অভাব। পেয়েও আশা মিটে না। নিত্যই অভাব বোধ। পেয়েও না পাওয়ার ব্যথাকে জাগিয়ে রাখা তবেই আস্বাদন। গৌর পরিকরের প্রতিজনের নাম ক'রে ক'রে কেঁদে কেঁদে তাঁদের চরণে লুটিয়ে লুটিয়ে প্রার্থনা করেছেন—

গৌরাঙ্গের গণ তোমরা
একবার দেখাও গো
ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি
চিতচোরা প্রাণগৌরাঙ্গ
মোর কি এমন দশা হব।
সে লীলা কি নয়নে হেরিব ॥
প্রাণভ'রে দেখব মোরা
রথের আগে নাচবে গোরা

অবশেষে নিজ গুরুপাদপদ্ম শ্রীল রাধারমণের শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন ক'রে বুকফাটা আর্ত্তি—

আজ একবার দেখা দাও
প্রাণ গৌর ল'য়ে কোথা বিহরিছ
সেই গৌর দেখাও হে
ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা

পরে নিজ দৈন্যে বলছেন—

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে—

গৌর ল'য়ে কিবা করব

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা

কপটতার মূরতি মোরা

অভিমানের খনি মোরা

ভালবাসতে জানি না মোরা

কোন গুণে গৌরাঙ্গ পাব

গৌর পাবার অধিকার নেই

একবার দেখব

সেই মূরতি কত শক্তি ধরে

চিতচোর মূরতিখানি

যার নামে ঘরের বাহিরে করে,

পরীক্ষা করব

বাৎসল্যময়ী জননীর কোল থেকে তার কোলের সন্তানকে কেড়ে নিলে সেই সন্তান হারিয়ে মায়ের যে বুকফাটা আর্ত্তি তার চেয়েও কোটিগুণ বেশী আর্ত্তি। কারণ পুত্রহারা জননীর আর্ত্তি কালের প্রবাহে শিথিল হয়ে আসে। তা না হ'লে মায়ের পক্ষে প্রাণধারণ করা সম্ভব হয় না কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজের এ আর্ত্তি কখনও ম্লান হয় নি। সারাটি জীবন একইভাবে অভাব বোধ—মনে হয় এখনই বুঝি কোলের ছেলে হারিয়ে গেছে।

বল বল ও বলদেব

বলে দাও সুভদ্রা দেবী

বল বল জগন্নাথ

তোমার গৌর মূরতি কোথায় আছে

সেই মূরতি কোথায় আছে

যা দেখে মুগ্ধ তুমি

একবার দেখাও হে
চিতচোর গৌরকিশোর
কে এমন বান্ধব আছে
প্রাণগৌর দেখাইবে
আজ একবার দেখা দাও
সপরিকর গৌর ল'য়ে হে পরম করুণ শ্রীগুরুদেব দেখা দাও।
এই গুণ্ডিচা দ্বারে
গৌর কিশোরীর মিলন রঙ্গ
জগন্নাথ নন্দনন্দন সনে
প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও
পাগল হ'য়ে বেড়াব
নীলাচলের পথে পথে
প্রাণভরে বলব
গৌরাঙ্গ রাধা জগন্নাথ নন্দনন্দন।
গুণ্ডিচা নিকুঞ্জ দ্বারে দোঁহাকার হল মিলন॥

এমন ক'রে গৌর দেখার জন্য প্রাণের ছটফটানি এমনটি একমাত্র শ্রীপাদের স্বরূপ ছাড়া আর কোথাও বোধ হয় দেখা যায় না। গৌরকে কতখানি প্রাণ উজাড় ক'রে ভালবাসলে এ অবস্থা হ'তে পারে আপনারা সুধী ভক্তবৃন্দ দরদী হৃদয় দিয়ে সহজেই অনুভব করতে পারবেন।

স্বপ্নবিলাস

ব্রজবিহারী শ্রীগোবিন্দজী ব্রজলীলায় একদিন নিধুবনে শ্রীগৌরস্বরূপ প্রকাশ করেন শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে স্বপ্নবিলাসে। এই প্রসঙ্গটিই মহাজন পদকর্ত্তা বলেছেন—

নিধুবনে দুঁহুজনে (আমরি) চৌদিকে সখীগণে
শুতিয়াছে রসের আলসে।
চকিতে চন্দ্রমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি রে
কাঁদি কাঁদি কহেন বঁধু পাশে॥

রাধারাণীর প্রাণ কেঁদে উঠেছে, স্বপ্নে এক গৌরবরণ যুবা পুরুষকে দর্শন করেছেন, তাতে তাঁর মনপ্রাণ আকৃষ্ট হয়েছে। এই যুবা পুরুষ কি অপরূপ রূপবান, এমন রূপ ত্রিভুবনে কোথাও তো দেখা যায় না। রাধারাণী আক্ষেপ ক'রে বলছেন—

কিবা তার রূপঠাম জিনি কত কোটি কাম হে
রসরাজ রসের সদন॥

তাতে আবার শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার—অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভাবভূষণে ভূষিত তনু, মহামত্ত হ'য়ে প্রেমে নাচছেন গাইছেন—এমন রূপ তো কভু দেখিনি। সে রূপে আমার মন মজেছে। তাইতো আমি কেঁদে আকুল। আজ আমার একি হ'ল, আমার পরপুরুষে মতি গেল। কারণ জন্মে পর্যন্ত নবজলধর রূপ ছাড়া আর কোন রূপ তো কখনও দেখিনি। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আখর দিচ্ছেন—

তোমা বিনে আন জানি না
আমি জনম ধরিয়ে
কেন পরপুরুষে স্বপনে দেখলাম
তবে কেন বিপরীত হেন হৈল আচম্বিত
কহ নাথ ইহার কারণে॥

চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন নাহি ভেল কদাচন হে
সে গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
কেন পরপুরুষে মতি গেল
হায় আমার একি হ'ল
এতেক কহিতে ধনি মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি
বিদগ্ধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া গোর মুখ চুম্বে বেরি বেরি রে
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥

কিশোরীকে কোলে দিয়ে নাগর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলছেন—

নাগর মনে মনে গণে রে
এই প্রেম আমায় গৌর করবে

শ্রীপাদ আস্বাদন করছেন—

(আমরি) বালাই লয়ে মরে যাই
শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের
শ্যামনাগর মধুর স্বরে বলেন
কিশোরীর ঐ দশা দেখে
মিছামিছি তুমি কেঁদো না রাধে
সে তো পরপুরুষ নয় গো
(সুন্দরী) যে দেখিলা গৌর স্বরূপ
সো নহি আন কেবল তুয়া প্রেম হে
মোহে করব তেন রূপ॥

নাগরেন্দ্র অনুরাগে বলছেন—

এবার আমি যে গৌরাঙ্গ হব
রাধে, সে তো পরপুরুষ নয় গো
রাধে, তোমার প্রেমঋণ শোধিবারে

কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর ।

পদকর্ত্তার এই পদ গভীর অনুভূতির সুরে মিশিয়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজ গাইলেন—

রাধে তোমার প্রেম কেমন
তোমার প্রেমের মাধুরী কেমন
সেই প্রেমে কি বা সুখ
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ হে
কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম
আমি কতই না চেষ্টা করিলাম
আমা হ'তে হবে না হে
আমি তো রসের বিষয় বটি
আশ্রয় জাতীয় সুখাস্বাদন
আমায় বিভাবিত হ'তে হবে
তোমার আশ্রয় জাতীয় ভাবে ,,
তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি হে
আসি নদীয়াতে করব উদয় ॥

তুমি যাকে স্বপ্নে দর্শন করলে সেই গৌরবরণ যুবাপুরুষ সে তো পরপুরুষ নয় ।

এবার আমি যে গৌরাঙ্গ হব
তিনবাঞ্ছা পুরাইতে
রাধে তোমার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি
নদীয়াতে করব উদয় ॥

স্বপ্নে তোমাকে গৌরবরণ যুবা পুরুষ দর্শন করিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম আমার বাসনা পূরণ হবে কিনা, আমার গৌর হওয়া হবে কিনা । তবে আমার গৌররূপে যখন তোমায় মন মজেছে তখন জানলাম বাসনা পূরণ হবে ।

একথা শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন কেন? তাঁর এ আস্বাদনের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। গোবিন্দ যদি রাধাভাবটি সম্পূর্ণ ক'রে নিতে পারেন, তবে শ্রীগোবিন্দের পক্ষে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন সম্ভব। যেমন সন্তান যেদিন নিজে পিতামাতা হ'তে পারবে, সেদিন তার পক্ষে পিতামাতার হৃদয়ের দরদ বা উদ্বেগ অনুভব করা সম্ভব হবে। এখন গোবিন্দ যে রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার ক'রে রাধারাণীর প্রেমকে গুরু ক'রে রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হ'য়ে রাধা হয়েছেন, এটি পরীক্ষা করবে কে? গোবিন্দ রাধারাণী হয়েছেন, যখন রাধারাণী হয়েছেন তখন তাঁকে গোবিন্দ ব'লে বুঝা যাবে না নিশ্চয়ই। গোবিন্দ ব'লে বুঝবে কে বা চিনব কে? যে গোবিন্দকে চেনে বা বোঝে সেইই বুঝবে বা চিনবে। এখন কথা হ'চ্ছে গোবিন্দকে চেনে এমন অনেক ভক্ত আছেন কিন্তু যিনি যতই গোবিন্দ চিনুন, রাধারাণী নিজে গোবিন্দকে যত ভালভাবে নিখুঁতভাবে চেনেন, এরকমটি চেনা আর কারও পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কারণ গোবিন্দ অনুভূতির চরম সীমা হ'য়ে আছেন শ্রীমতী রাধারাণী। সুতরাং তাঁর মত গোবিন্দকে জানা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন এ জগতে কোন ব্যক্তিকে তার দাস, সখা, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়, পরিজন, সবাই চেনে কিন্তু তার নিজের পত্নী যেমন ক'রে তাকে জানে, এরকম জানা আর কারও পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সেই ব্যক্তি যদি কোন অভিনয়ে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন তখন অন্যান্য দর্শক তাকে হয়ত চিনতে পারে না কিন্তু তার নিজের পত্নী যদি তাকে সেই ভূমিকায় চিনতে না পেরে অন্য 'কোন পুরুষ ব'লে মনে করে, তবে তার সেই ভূমিকায় অভিনয় করা সার্থক হয়েছে বুঝতে হবে। এখানেও তেমনি। গোবিন্দ যে গৌর হয়েছেন রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার ক'রে, এটি অন্য কেউ বুঝতে না পারে তাতে কোন কথা নেই কিন্তু রাধারাণী যদি সেই গৌরস্বরূপ দেখে গোবিন্দই যে গৌর হয়েছেন; এটি যদি বুঝতে না পারেন তাহলে

গোবিন্দের গৌর হওয়া সার্থক। এখানে স্বপ্নবিলাসে তাই হয়েছে। স্বপ্নে যখন রাধারাণী এক গৌরবরণ যুবাকে দর্শন করলেন এবং তাঁকে গোবিন্দ ব'লে বুঝতে পারলেন না বরং পরপুরুষ ব'লে মনে করেছেন এবং আমার পরপুরুষে মতি গেল, আমি কি ব্যভিচারিণী হলাম এই বলে আক্ষেপ করেছেন এবং কেঁদে আকুল হয়েছেন তখন বুঝা যাচ্ছে গোবিন্দের গৌর হওয়া সার্থক হয়েছে, যাতে গৌরস্বরূপে রাধারাণী গোবিন্দ গন্ধ পর্য্যন্ত পাচ্ছেন না। তাইতো গৌরকে পরপুরুষ ব'লে মনে করেছেন এবং এই পরপুরুষে মন আকৃষ্ট হয়েছে মনে ক'রে কেঁদে আকুল হয়েছেন। গোবিন্দের যখন গৌর হওয়া সার্থক হ'ল তখন তো স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে গোবিন্দের হৃদয়ে ব্রজলীলায় যে তিনটি বাসনার উদয় হয়েছে, সেটি পূরণ হবে নিশ্চয়ই। কারণ রাধারাণী হ'তে পারলে তবে তো রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন সম্ভব। গোবিন্দের রাধা হওয়ার স্বরূপই তো গৌর।

তাই গোবিন্দ বললেন—

আমার গৌররূপে তোমার মন মজেছে, এবার জানিলাম বাসনা পূরণ হবে।

পদকর্ত্তা বললেন—

নদীয়াতে করব উদয়॥

সাধিব মনের সাধা ঘুচিবে সকল বাধা

ঘরে ঘরে বিলাব প্রেমধন।

শ্যামনাগরের এ কথা শুনে রাধারাণীর অন্তর শিউরে উঠেছে। ব্যাকুল হ'য়ে বললেন—তা কি করে হয়? তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে ব্রজের জীবনকে হারিয়ে ব্রজবাসীর প্রাণ বাঁচবে কি ক'রে? জল বিনা যেমন মীন বাঁচে না, মণি ছাড়া যেমন ফণী বাঁচে না তেমনি তোমায় ছেড়ে ব্রজবাসী তো একতিলও প্রাণে বাঁচবে না। এই ব্রজজনে বধ ক'রে আবার কোন খেলা খেলবে। রাধারাণী আকুল হ'য়ে বলছেন—বঁধু তিন বাঞ্ছা পুরাইতে সকলকে ছেড়ে যাবে, তার

সঙ্গে আমাকেও কি ছেড়ে যাবে ? ভাবী বিরহ উৎকণ্ঠায় রাধারাণী কেঁদে আকুল হয়েছেন ।

শ্যামসুন্দর মধুর স্বরে রাধারাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

ব্রজ ছেড়ে কোথাও যাব না রাই

আমি যেখানে ব্রজ সেখানে

ব্রজপুর পরিহরি কবহু না যাব ।

ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ ॥

গোপ গোপাল সবহুঁজন মেলি ।

নদীয়া নগর পর করবহুঁ কেলি ॥

আমি তো, একা গৌর হব না রাই

রাধে তোমাতে আর আমাতে তনু তনু মেলি

দুজনে মিলে গৌর হব

তনু তনু মেলি হই এক ঠাম ।

অবিরত বদনে বোলব হরিনাম ॥

দুজনে মিলে গৌর হব

হরি বলব বলাইব

রাধারাণীর মনে চমক লেগেছে

শ্যামনাগরের কথা শুনে

তাই অবাক হ'য়ে বলছেন—

আমাকে যে সঙ্গে লবে দুই তনু এক হবে

এ অসম্ভব হইবে কেমনে ।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করছেন—

বালাই লয়ে মরে যাই রে

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেমার

ঐশ্বর্য্য জানে না রে

কেবলার গণ কৃষ্ণের

তারা আর তো কিছু জানে নারে

আমাদের নন্দনন্দন বিনে

নিজ সম্বন্ধ না মানে

ঐশ্বর্য্য দেখিলে কৃষ্ণে

ওহে বঁধু দুই কেমন করে এক হবে, এ যে বড় অসম্ভব কথা।

এ যে বড় অসম্ভব কথা

দুই দেহ এক হবে

চূড়া ধরা বাঁশী এসব লুকিয়ে কাল গৌর হবে কেমন করে ?

রাধারাণীর কথা শুনে কৃষ্ণচন্দ্র নিজের বক্ষের কৌস্তুভ মণিতে রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গের প্রতিবিম্ব দেখালেন এবং নিজে তাতে প্রবেশ ক'রে দুই তনু এক হলেন।

দু'জনে মিলে গৌর হল

প্রাণ রাধা রাধারমণ

মহাভাব রসরাজ

পদকর্ত্তা শ্রীবৈষ্ণবদাসজী বলছেন—

নিধুবনে এই ক'য়ে দুই তনু এক হ'য়ে

আসি নদীয়াতে করল উদয়।

সঙ্গেতে সে ভক্তগণে হরিনাম সংকীর্ত্তনে

প্রেমবন্যায় জগত ভাষায়॥

বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রস আস্বাদন

ব্রজবাসী সখা-সখী সঙ্গে।

বৈষ্ণবদাসের মন হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ

না ভাসিলাম সে সুখতরঙ্গে॥

গৌর স্বরূপে—সকলের বাসনা পূরণ

শ্রীগোবিন্দরূপ

শ্রীমতী রাধারাণী ও রাধারমণ ব্রজের নিধুবনে এইভাবে দুই তনু মিলে এক হ'য়ে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে প্রকাশ পেলেন। ব্রজের শ্রীগোবিন্দের রূপমাধুরী পদকর্ত্তা শোনালেন—

"শ্রীগোবিন্দ মুখারবিন্দ, নিরখি মন বিচারো রে"—শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের দর্শনের কথা মহাজন বলেছেন। গোবিন্দের মুখকমল, গোপীনাথের বক্ষস্থল আর মদনমোহনের চরণযুগলে ভক্তগণ দৃষ্টি দেন। তাই শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো রে। পদকর্ত্তার এই পদের উপরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করছেন—

নিরখি মন বিচারো রে
শ্রীরাধিকা নয়ন রঞ্জন মুখ
যে মুখ দেখতে রাধা অনিমিখ
যে মুখ অনিমিখ দেখতে সাধ করে গো
আমাদের ভানুনন্দিনী
নিরখি মন বিচারো রে
কিশোরী নয়ন রঞ্জন মুখ
অলকা আবৃত বদন
হাসিয়া বাঁশিয়া বদন
বংশী গানামৃত ধাম
লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
নিরখি মন বিচারো রে
"চন্দ্রকোটি ভানুকোটি কোটি মদন ওয়ারো রে॥
ছার গগন চাঁদে কিসে বা গণি
শ্রীগোবিন্দের অকলঙ্ক মুখচাঁদের আগে

গগনচাঁদে কলঙ্ক আছে

গগনচাঁদে প্রতিপদ আছে

বদনচাঁদ অকলঙ্ক নিশিদিশি ষোলকলা

"সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজদল নয়না।"

সহজেই হাসিমাখা

অধরবিম্ব মধুরহাস

শ্রীপাদ আস্বাদনে—অক্ষর সুধা বর্ষণ করছেন—

হাসি নয় যেন চাঁদ ফাটল

আমার শ্রীগোবিন্দ মুখে

হাসি নয় যেন ফাটল শশী

ঝরিল অমিয় রাশি রাশি

হাসি নয় ও যে প্রেমের ফাঁসি

আঁখি-পাখী ধরা ফাঁসি

মনপ্রাণ উদাসী ক'রে করে দাসী

অধর বিম্ব মধুর হাস কুন্দ কলিকা দশনা॥"

হাসি নয় যেন চাঁদ ফাটল

তার মাঝে দন্তপাঁতি কুন্দ ফুটল

হাসি নয় যেন চাঁদ ফাটল

"মণিকুণ্ডল মকরাকৃতি, অলকা ভৃঙ্গপুঞ্জা।"

গণ্ডস্থলে ভাল দোলে

মকরাকৃতি কুণ্ডল

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

বরজ ললনার মনোমীন গিলিবে ব'লে

অলকা নয় যেন ভৃঙ্গাবলী

যেন অলকারূপে বিরাজিছে

দেখে এই মনে হয়

নীলকমল মধু পিবে বলে

গোপনে গোবিন্দ মুখ

অলকারূপে বিরাজিছে

"কেশরক তিলক বনিয়ো, সোণে মোড়ি গুঞ্জা ॥"

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অন্তরের অন্তস্তল হ'তে রসের ঝরণা বইছে—তারই উচ্ছ্বসিত প্রকাশ—

মদন বিজয়ী ধ্বজা

নন্দকিশোরের নাসায় কেশরের তিলক

পরিসর হিয়ায় দোলে

স্বর্ণমণ্ডিত গুঞ্জাহার

বরজ ললনাচিত দোলাবে ব'লে

"নবজলধর তড়িতাম্বর বনমালা গলে শোহে।"

লীলানট সুরকো পহুঁ, রূপে জগমন মোহে ॥"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁর প্রাণের অনুভূতিটি ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন—

একা মেনে আমি নই গো

সে যে জগমনোমোহনিয়া

সেই "শ্রীনন্দনন্দন গোপীজন বল্লভ

শ্রীরাধানায়ক নাগর শ্যাম।

সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর

সুরমুনিগণ মনোমোহন ধাম ॥

জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর

জয় নিজ প্রেয়সী ভাব বিনোদ ॥"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিগূঢ় গৌরাঙ্গ লীলার গোপন রহস্যটি উদ্ঘাটন করেছেন—

অপরূপ রহস্য রে

নিগূঢ় গৌরাঙ্গ লীলার

সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ত্তি লীলা

হইল ইচ্ছার উদ্গম

ব্রজবিহারী নন্দনন্দনের

রাধার প্রেমমাধুর্য্যাধিক্য দেখে

আমি তো ভুবন মোহন

কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি উহায় আস্বাদিব

পদকর্ত্তা বলেছেন—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের বাক্য—

"কৈছন রাধাপ্রেমা কৈছন মধুরিমা

কৈছন সুখে তিঁহ ভোর।"

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন

সে প্রেমের মাধুরী কেমন

রাধাপ্রেমে কিবা সুখ

এ তিন বাসনা ব্রজলীলায় শ্রীগোবিন্দ স্বরূপে থেকে পূরণ করা কিছুতেই সম্ভব হয় নি,—গোবিন্দ চেষ্টা করেছেন, উপায়ও খুঁজেছেন —কিন্তু শেষপর্য্যন্ত বললেন—

কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

আমা হ'তে হবে না

কেন হবে না—তার কারণও দেখালেন—

আমি তো লীলার বিষয় বটি—তাই আশ্রয়জাতীয় সুখাস্বাদন আমা হ'তে হবে না।

আমায় বিভাবিত হ'তে হবে

আশ্রয় জাতীয় ভাবে

মহাভাব স্বরূপিনীর ভাবে

তাই— "রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি

আসি নদীয়াতে করিল উদয়॥"

সবাই বলে গৌরহরি

আশ্রয়জাতি শ্রীমতী রাধারাণী, তাঁর ভাবকান্তি অঙ্গীকার ক'রে

বিষয় জাতি গোবিন্দ আজ গৌর হয়েছেন। কারণ বিষয়জাতি আশ্রয়জাতি হ'তে না পারলে আশ্রয়জাতির আস্বাদন পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন প্রাকৃত জগতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—সন্তান (পুত্র বা কন্যা) জ্ঞানে গুণে যতই বড় হোক্ তার পক্ষে পিতামাতার অন্তরের দরদ বা উদ্বেগ জানা কিছুতেই সম্ভব হয় না। এ জগতে তো রস হয় না, তবে রসের মত দেখতে। প্রীতি, ভালবাসা বলা যায়—প্রীতির দুটি জাতি। আশ্রয়জাতি ও বিষয়জাতি। যেখানে প্রীতি তৈরী হয় তাকে বলে আশ্রয়জাতি আর সেই প্রীতি যেখানে যায়, যে ভোগ করে তাকে বলা হয় প্রীতির বিষয়জাতি। পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে যে প্রীতি বা ভালবাসা তারই নাম বাৎসল্য প্রীতি। এই বাৎসল্য প্রীতির আশ্রয়জাতি পিতামাতা এবং বিষয়-জাতি সন্তান। তাই বিষয়জাতি কোনদিন আশ্রয়জাতির আস্বাদন পেতে পারে না। তবে বিষয়জাতি যদি কখনও নিজে আশ্রয়জাতি হ'তে পারে অর্থাৎ পুত্র বা কন্যা নিজে যদি কোনদিন পিতা বা মাতা হ'তে পারে তাদের পক্ষে পিতামাতার অন্তরের দরদ বা উদ্বেগ জানা সম্ভব। এখানেও সেই একই নিয়ম। রাধারাধারমণের লীলায় মধুর রস। রাধারাণী মধুররসের আশ্রয়জাতি আর রাধারমণ হলেন বিষয়জাতি। তাই শ্রীগোবিন্দের পক্ষে রাধারাণীর প্রেম আস্বাদন সম্ভব নয়। তবে সম্ভব হবে ঐ নিয়মে—যদি রাধারমণ কখনও রাধারাণী হ'তে পারেন। তখন তাঁর পক্ষে রাধারাণীর আস্বাদন পাওয়া সম্ভব। আজ শ্রীগোবিন্দ রসরাজ মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর ভাব কান্তি অঙ্গীকার ক'রে যখন গৌর হলেন তখন তাঁর পক্ষে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন করা সম্ভব হল। আজ রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত শ্রীগোবিন্দকে সবাই বলে গৌরহরি।

সবাই বলে গৌরহরি

আজ নদীয়াবিহারী হেরি

তা' ত' নয়, তা ত' নয়

ও যে আমাদের রাইকিশোরী

পলকে প্রলয় গণে

শ্যাম বঁধুর অদর্শনে

কোটি যুগ মানে গো

এক পলক না দেখিলে

বঁধুর বিরহ সইতে নারি

ফিরছে বঁধুকে বুকে ধরি

যেন ভিন্ন মনে করো না

ব্রজ আর নদীয়া

নবদ্বীপরূপে বেকত

ব্রজের গুপত কুঞ্জের গুপত কুঞ্জ

নদীয়ায় নিরন্তর বিহরে

পরস্পর বুকে ধ'রে

নিরন্তর জড়াজড়ি

কখনও নয় ছাড়াছাড়ি

অপূর্ব্ব মিলন রে

পরস্পর বিপরীত

রাই কানু—কানু রাই

এ যে মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য

মিলনে মিলা অমিলা দুই রসের খেলা

নিরন্তর মিলন না হ'লে নিরন্তর ক্রীড়া কেমন করে হবে ?

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ জগজীবের প্রতি করুণার উচ্ছলনে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করছেন—

ঐ মূরতি হৃদে ধর

নিরন্তর ক্রীড়া ভোগ কর

সেই গৌরমূরতি হৃদে ধর

সে যে আশ মিটান মূরতি রে

শুধু কেবল যুগলের নয়

সকলের বাঞ্ছা পূরণ হ'ল

ব্রজের সখাসখী, স্থাবরজঙ্গম, গুল্মলতা, সংকীর্ত্তন রাসরঙ্গে সকলের বাঞ্ছা পূরণ হ'ল। যুগলের মিলনেতে কেমন মাধুরী সেটি দেখবার জন্য রাধারাণীর মনে সাধ জাগল। তাই রাধা গদাধররূপে সেই মাধুরী আস্বাদন করছেন। আবার অনঙ্গ নিতাই হয়ে সেবাসুখ মিটাইছে।

নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী

আস্বাদিতে সেই মাধুরী

এই লীলায় সকলেই মূরতি ধরেছে—

শ্রীনিত্যানন্দরূপে মূরতি ধরেছে

অনঙ্গকেলি মূর্ত্তিমন্ত

ঠাকুর নরহরিরূপে মূরতি ধরেছে

আবার যুগলকিশোরের বিলাস

তাই বিলাস বিলাস আস্বাদিছে

শ্রীল বাবাজী মহারাজ করুণা ক'রে আস্বাদনের উপায়টিও বলেছেন—

যদি অনুভব করতে চাও

যদি ভোগ করতে সাধ থাকে

বিলাসের পরিণতি লীলা

তবে রাধাপদ আশ্রয় কর

শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে

সেবা স্বভাব জাগায়ে দেয়

গদা রাধা কৃপা ক'রে

রাধা গদাধরের শরণ লও

গোরারসে ডুবে যাও

গোরারসে ডুবে যাও

মহারাসবিলাসের পরিণতি
যুগল উজ্জ্বলরস নির্য্যাস
রাধাগদাধরের শরণ লও
গোরারসে ডুবলে পরে
নিরন্তর গান করবে
"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরারূপ না হেরিলে
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর হেম কান্তি কলেবর
সতত হিয়ার মাঝে রাখি॥"

শ্রীপাদের সুমধুর রসের উদ্গার—
বল বল ভাই গৌর বল
আর কিছু লাগে না ভাল
বল জয় জয় গৌরহরি
রাইকানু জড়াজড়ি

সূচক কীর্ত্তন—গৌরচন্দ্র

আদর্শ শ্রীগৌরাঙ্গদাস শ্রীল বাবাজী মহারাজ অশেষ বিশেষে ভক্তিরস আস্বাদনে অভিলাষী। যাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিরস আস্বাদনে লোলুপ তাঁরা মুক্তিপ্রয়াসী কখনও হ'ন না। বরং মুক্তিকে হীন দৃষ্টিতে তুচ্ছ দৃষ্টিতেই দেখেন—কারণ জন্ম মৃত্যু নিরোধরূপ যে মুক্তি যা একমাত্র ভক্তিদর্শন বাদ দিয়ে আর প্রায় সব দর্শনের চরম কাম্য বস্তু হয়ে আছেন, সেই মুক্তিতেও জীবের স্বরূপ-স্মৃতি ফুটছে না, সেখানেও একটি অভাব জেগে আছে। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'—এইটিই জীবের ঠিক ঠিক স্বরূপ। এই স্বরূপ ভুলে যাওয়ার ফলেই জীবের ওপর মায়া পিশাচীর আক্রমণ এবং জীবের যত লাঞ্ছনা ভোগ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাই বললেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
তে কারণে মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁধিল॥

কারণ মুক্তিতে জন্মমৃত্যু বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু জীবের স্বরূপ বোধ ফোটে নি ব'লে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বোধটি জাগছে না। দাস প্রভু এই নিত্য সম্বন্ধ না জাগার ফলে সেবা সুখ প্রাপ্তি হচ্ছে না—তাই মুক্তিতেও অপূর্ণতা। ভক্ত ভক্তিরস পিয়াসী, মুক্তিকে তাই তিক্ত বোধ করে। ভক্তিসুধারস আস্বাদনে ডগমগ হ'য়ে ত্রিভুবনের যত সুখৈশ্বর্য্য সব তার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে যায়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাই—যে আচার্য্য যেভাবে ভক্তিরস আস্বাদন করেছেন তাঁর আনুগত্যে সেই ভাবের কক্ষায় দাঁড়িয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা আস্বাদন করেছেন। অন্তরে এই অপূর্ব্ব আস্বাদনের অভিলাষের ফলেই তিনি পূর্ব্বাচার্য্য গৌরাঙ্গগণের সূচক কীর্ত্তনের মাধ্যমে সেইভাবের কক্ষায় দাঁড়িয়ে নিজে সেই ভাবের রস আস্বাদন ক'রে শ্রোতাদের সেই আস্বাদনের অধিকারী ক'রে দিতেন। এইটিই হ'ল শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের সূচক কীর্ত্তনাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

আনুসঙ্গে লোকশিক্ষা তো হয়েছেই। লোকশিক্ষার মনোভাব নিয়ে তিনি কখনও কোন কীর্ত্তন করেন নি। এমনকি কোন যাজনও সেই মনোভাব নিয়ে করেন নি। যা করেছেন শুদ্ধ ভক্তিরস আস্বাদনের জন্যই করেছেন। কীর্ত্তন প্রসঙ্গের জন্য কেউ তাঁকে আহ্বান করলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে জানাতেন 'তুমি আমাকে কৃপা করলে। মহাপ্রভুর গুণ গাইবার সুযোগ ক'রে দিলে। তবু তাঁর আচরণে বা সংকীর্ত্তনে জনসাধারণ যে গৌরাঙ্গ ভজনের শিক্ষা লাভ করেছেন তার তুলনা হয় না।

দাতা যখন দান করেন তখন দান করছি এই মনোভাব নিয়ে দান করলে তা'তে দানের মহিমা খর্ব্ব হ'য়ে যায়, কারণ তাতে দাতার মনে অভিমান থাকে। তাই সে দান ঠিক হয় না। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ কিছু দান করব ব'লে যে মহাজনগণের সূচক কীর্ত্তন করতেন তা নয়—কিছু গ্রহণ করবার মানসেই তা করতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যেত তাঁর আচরণে। এক এক মহাজনের ভক্তিরস আস্বাদনের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীল বাবাজী মহারাজের মধ্যে সকল মহাজনের বৈশিষ্ট্যই দেখা গেছে। শ্রীল রূপসনাতনের ভক্তিরস উপযোগী কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, বৈরাগ্য, ঠাকুর শ্রীহরিদাসের নামনিষ্ঠা, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিজীর পাষাণের রেখার মত ভক্ত্যঙ্গযাজনের নিয়ম নিষ্ঠা, রামচন্দ্র কবিরাজের গুরুনিষ্ঠা প্রভৃতি শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রতিটি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এই লোভ মূলে থাকায় তাঁর সূচক কীর্ত্তনে এত আকর্ষণ। তাই তিনি তাঁর কীর্ত্তনময় জীবনকে এই সূচক কীর্ত্তনেতেই সাঙ্গ করলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের সূচক কীর্ত্তন ক'রে তাঁর ঠিক পরদিন লীলা সঙ্গোপন করলেন। জীবন ভরে যত মধু আহরণ করেছিলেন, সব সেদিন ঢেলে দিলেন প্রেমের গাগরী ঠাকুর নরহরি মধুমতীর সূচককীর্ত্তনে।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তন প্রসঙ্গ নিত্য ও নৈমিত্তিক॥

সূচককীর্ত্তন এই নৈমিত্তিক কীর্ত্তনের অন্তর্গত। সূচককীর্ত্তন হলেন পূর্ব্বাপর মহাজনগণের গুণকীর্ত্তন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ এই কীর্ত্তনের মাধ্যমে জগতে যে কৃপা বর্ষণ করেছেন তা সমুদ্রের মত অপার অনন্ত অগাধ! এই কৃপার অনন্ততা বোধ যেন জীবনে কণামাত্র লাভ হয়—এইটিই শ্রীসাধু বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা।

এই সূচক কীর্ত্তনের শ্রীগৌরচন্দ্র একটি বিশেষ দিক। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকীর্ত্তনে যেমন প্রথমেই শ্রীগৌরচন্দ্র গান করবার নিয়ম আছে, কারণ রাধামাধবের লীলা মধুর রসের লীলা। সেটি জীবের পক্ষে বড় দুষ্পাচ্য কারণ কলিজীবের পাকস্থলী বড় দুর্ব্বল। তাই গৌরচন্দ্র অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরকে সেই লীলা আস্বাদন করিয়ে প্রসাদ ক'রে মহাজন আস্বাদন করেছেন। তাতে সহজে অনুভব হবে। মহাজন বড় চতুর। আর তাছাড়া রাধামাধবের লীলা কলির গাঢ় অন্ধকারে জীবের কাছে দুর্লক্ষ্য বস্তু, দেখা যায় না অর্থাৎ অনুভব করা যায় না—শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাকিরণ (চন্দ্রিমা) স্পর্শে তা আলোকিত হ'য়ে জীবের হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করবে। শ্রীসূচক কীর্ত্তনে গৌরচন্দ্রেরও সেই একই তাৎপর্য্য। মহাজন চরিত অনুশীলন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা ছাড়া কোন মতেই সম্ভব নয়। সূচককীর্ত্তনের একটি মহাজনী পদ আছে—

প্রেমসিন্ধু গোরারায় নিতাই তরঙ্গ তায়
করুণা বাতাস চারিপাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাফাল ছাড়ে
তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে॥
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত হংস চক্রবাকে পিব পিব বলি ডাকে
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয়॥
ডুবি রূপ সনাতন তোলে নানা রত্নধন
যতনে গাঁথিল তার মালা।

ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি লহ জীব কণ্ঠ ভরি
দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা ॥
লীলারস সংকীর্ত্তন বিকশিত পদ্মবন
জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কমলবন মাতিল ভ্রমরগণ
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে ॥

মহাজনের এই সংক্ষিপ্ত পদটি শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁর সারা-জীবনের একনিষ্ঠ ভজন প্রভাবে অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব ক'রে কিভাবে ছন্দে-রূপে-রসে ভরিয়ে জগতে ভক্তগণকে কৃপা ক'রে দান করেছেন—তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। কিন্তু তাঁর নিজের অনুভব হ'ল—এ দান নয়, গ্রহণ। দানের মনোবৃত্তি কখনও তাঁর জাগে নি। সর্ব্বদা কাঙাল হ'য়ে করজোড়ে ভিক্ষার মত গ্রহণ করেছেন। শ্রীমুখে বলেছেন—

এসেছে কাঙাল তোদের দ্বারে
আর কিছু চায় না ভিখারী
একবার কৃপা করে নাম শোনাও

"প্রেমসিন্ধু গোরারায়" মহাজনী এই পদে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের প্রাণভরা আস্বাদন—রসময় গৌরকিশোর আমার প্রেমসিন্ধু। প্রেমসিন্ধু—প্রেমের সিন্ধু অর্থাৎ সাগর। সাগরে তো জল থাকে গৌর প্রেমসিন্ধুতে কোন জল ? শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমবিকারের বারিময় প্রেমসিন্ধু গোরা রায়।
সাগর যখন, তখন শত শত ধারা বইবে। তাই—

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতসার বহে শত শত ধার
বহে শত শত ধার
নিরন্তর যাহা হইতে দশদিকে
আমরি অক্ষয় পারাবার

নানাভাবে রত্নালয়

সাগর যেমন রত্নালয়—নানারত্নের আকর, গৌরপ্রেমসিন্ধু তেমনি নানাভাব রত্নাকর।

এই গৌরপ্রেমসিন্ধুর তো তরঙ্গ আছে, এ তরঙ্গ হ'ল নিতাই তরঙ্গ। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করছেন—

হেলে দুলে খেলায় রে

ওরে ভাইরে আমার নিতাই তরঙ্গ

গৌরপ্রেমসিন্ধু হিয়ায়

সাগরেব তরঙ্গ বাতাসের স্পর্শে উদ্বেলিত হয়? এখানে নিতাই তরঙ্গ কোন্ বাতাসে উদ্বেলিত হয়? এ বাতাস হ'ল 'করুণা' বাতাস—

"করুণা বাতাস চারিপাশে।"

করুণাবাতাসের স্পর্শ পেয়ে প্রেম উথলে পড়ছে।

আমার নিতাই তরঙ্গ সনে অদ্বৈত করুণা বাতাস পরশে

"প্রেম উথলিয়া পড়ে"

উথলিয়া ভাসায় রে

আমার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমসিন্ধু

প্রেমজলে ডুবায় রে

স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা

প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাফাল ছাড়ে

তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে॥

নিতাই তরঙ্গ যোগে উচ্ছলিত অদ্বৈত করুণা বাতাস পরশে উদ্বেলিত সেই প্রেমজল সিঞ্চন ক'রে—

তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে॥

নিতাই চৈতন্য আমার বড় দয়াময়—

এমন হয় নাই আর হবার নয় রে

এমন পরমকরুণ প্রেমদাতা

প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গের মত—এমন পরম করুণ প্রেমদাতা হয় নাই আর হবার নয়।

বড় অবতার রে

প্রভু নিভাই প্রাণ গৌরাঙ্গ

শ্রীপাদ বড় অবতার বললেন কেন? কত কত অবতার হয়েছেন কাউকে তো বড় অবতার বলা হয় নি। নিতাই গৌরাঙ্গ বড় অবতার, তার কারণ শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজেই বলেছেন—বড় অবতার এইজন্য—

"পতিতেরে বিলাওল প্রেমেরই ভাণ্ডার রে"

পতিতের বন্ধু, পতিতের দরদী—পতিতের দুঃখে প্রাণ কাঁদে—এমনটি নিতাই গৌর ছাড়া আর কেউ নেই। পতিতকে এই প্রেমধন বিলানটি কেমন? শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন—

আমরি যারে তারে যেচে দিল

চির অমর্পিত প্রেমধন

গিয়ে আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে

দন্তে তৃণ গলবাসে করজোড়ে—

গিয়ে আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে

যারে তারে যেচে দিল

প্রেম দিল আচণ্ডালে

আপনাকে সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা

আপনাকে পুত্র সখা প্রাণপতি করা

আপনাকে বশ করে অধীন করা

আয় আয় কে নিবি আমায় কিনিবি ব'লে

ও ভাই বড় অবতার রে—

এইখানেই নিতাই গৌরের বড় অবতারত্ব। তাই মহাজন বললেন—

ও ভাই দেখ দেখ, নিতাই চৈতন্য দয়াময়।

রসময় গৌরকিশোর তো প্রেমসিন্ধু,—এ সাগরে হংস চক্রবাক কারা ? মহাজন বললেন—

“ভক্ত হংসচক্রবাকে তারা পিব পিব বলি ডাকে
ভাইরে পাইয়া বঞ্চিত কেন হয় ॥”

ভক্ত হলেন হংস এবং চক্রবাক—তাঁরাই প্রাণভরে আস্বাদন করেন। এই রসপানের সুযোগ পেয়েও যারা বঞ্চিত হয় তারাই দুর্ভাগা।

গৌরপ্রেম সিন্ধু নানা ভাব-রত্নালয়। কিন্তু এ রত্ন তো নিজে পাওয়া যায় না। সাগর রত্নকে গর্ভে ধারণ করে বলেই তার নাম রত্নাকর। এ রত্ন আহরণ করে ডুবারু, ডুবারু ডুব দিয়ে রত্ন তোলে। এখানে গৌর প্রেমসিন্ধুতে ডুব দিয়ে রত্ন তুলতে পারে এমন ডুবারু কে ? মহাজন বললেন—“ডুবি রূপ সনাতন”

ডুবারু সাঁতার দিয়ে রত্নের সন্ধান পেতে পারে না—তাকে ডুব দিতে হয়, অতলে তলিয়ে যেতে হয়। তাই শ্রীরূপ শ্রীসনাতন পাকা ডুবুরি—তারা সাঁতার ভুলে ডুবেছিল। এই দুর্ব্বাসনা তরঙ্গময় সংসার সাঁতার ভুলে ডুবেছিল—কারণ সাঁতার দিলে আর ডোবা যায় না—

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন নিজেরা ডুবে জগৎকে দেখালেন কেমন করে ডুবতে হয়—তাই তারা শিক্ষাগুরু। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন —শিক্ষাগুরুরূপী তাঁরা কেমন ক'রে ডুবতে হয় তাই জানাবার লাগি সাঁতার ভুলে ডুবেছিল !

এই রসময় গৌরকিশোরের রস সাগরে তারা নিজেরা ডুবে জগৎকে দেখালেন।

ওহে ও প্রাণ গৌরাঙ্গ যা কর ব'লে তারা সাঁতার ভুলে ডুবেছিল।

সাঁতার না ভুললে তো ডোবা যায় না। তরঙ্গের ওপর তো সাঁতার দেওয়া হয়, এখানে সংসার সাঁতার কোন তরঙ্গের ওপর ? এখানে দুর্ব্বাসনা তরঙ্গসঙ্কুল সংসার সাগর। দুর্ব্বাসনা আজকের নয়—অনাদিকালের। এই দুর্ব্বাসনার ফলেই জীবের গতাগতি। আমি

এবং আমার বোধ—এর নামই সংসার। দেহকে আমি বুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে আমার বোধ, এর ওপরই সংসার দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই এই আমি আমার বোধ দূর না হ'লে তো সংসার সাগর পার হওয়া যাবে না। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করছেন—

ডুবা তো যায় না
এ সংসারে আমি আমার না ঘুচিলে
আমি তোমার না হইলে
কায়মনোবাক্যে না বিকালে
আমি তোমার হলাম ব'লে—কায়মনোবাক্যে না বিকালে
ডুবা তো যায় না

রত্ন ডুবারু সাগর থেকে তোলে—সেই রত্নে রত্নহার তৈরী হয়। এখানে শ্রীরূপ শ্রীসনাতন রত্ন তুলে মালা গেঁথেছেন! মহাজন বললেন—

"ডুবি রূপ সনাতন তুলি নানা রত্নধন
যতনে গাঁথিল তার মালা।"

রত্নে মালা হয় বটে—কিন্তু শুধু রত্নে তো মালা হয় না। মালা গাঁথতে হ'লে সূত্র চাই। এই রত্নমালা গাঁথবার জন্য একটিই সূত্র, সেটি হ'ল ভক্তিসূত্র। তাই—

ভক্তিসূত্রে গ্রন্হি করি লহ জীব কণ্ঠ ভরি
দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা॥"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ নয়নে শতধার অশ্রু বিসর্জন ক'রে জীবের দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে বলেছেন—

মালা পররে তর রে
এ যে পর তর মালা
বিশুদ্ধ ভকতি সিদ্ধান্ত রত্নমালা
গৌর প্রেমসিন্ধুতে ডুব দিয়ে তোলা

শ্রীরূপ সনাতন উদ্ধারের তোলা বিশুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত রত্নমালা, মালা পররে তর রে।

এ মালা পরলে কি হবে? ফলশ্রুতি কি? ত্রিতাপ জ্বালা তো যাবেই কিন্তু এটি মুখ্য ফল নয়—ওতো আনুসঙ্গে হবে মুখ্যফল শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—

কৃষ্ণে সুদৃঢ় মতি হবে, মালা পররে তররে। ভাই, দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা। কারণ মহাজনের শ্রীমুখের বাণী আছে—

"সিদ্ধান্ত করিতে কভু না কর অলস রে।
সিদ্ধান্তে লাগয়ে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস রে॥

এ নামমালা, ভক্তিসিদ্ধান্তের মালা দুটি কাজ করবে, অভাব মেটাবে স্বভাব জাগাবে। জীবের চিরকালের অভাব দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবে আর স্বভাব জাগিয়ে নিত্য আনন্দে ভরিয়ে দেবে। সংসার করতে আরম্ভ করে মানুষ দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে, সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহার। সুখ যেন আমার কাছে চিরদিন বাঁধা হ'য়ে থাকে এবং দুঃখের মুখ যেন কখনও দেখতে না হয়। এইজন্য মানুষের যা কিছু প্রবৃত্তি, কর্মচেষ্টা। কিন্তু মজা এমনই যে সংসার করতে করতে সে দেখে দুঃখই চিরজীবন বাঁধা হয়ে রইল, সুখের মুখ দেখা হ'ল না। এই অভাব দূর হ'য়ে স্বভাব জাগবে এই নামমালার আশ্রয় নিলে। তা না হ'লে জ্বালা জুড়াবার আর কোন উপায় নেই। যতই সাধন করুক না কেন এই প্রেমলক্ষণা ভক্তির এই সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে জীব কিছুতেই স্থির হ'তে পারে না। এ চঞ্চল সংসারে মন স্থির করবার অন্য কোনও পথ নেই। একমাত্র নামাশ্রয় বিনা ভাই অন্য কোনও উপায় নেই। শ্রীপাদ বারে বারে কেঁদে কেঁদে বলেছেন। এই নামই চিত্তকে স্থির করবার একমাত্র উপায়। তাই সারাটি জীবন শ্রীপাদের বুকফাটা আর্ত্তি—ধর, পর হরিনামের মালা—যাবে জ্বালা পাবে নন্দলালা। হ'য়ে ব্রজবালা পাবে নন্দলালা, ধর পর হরিনামের মালা। এই নাম

ভুলাবার অনেক আছে, কারো কথায় ভুলো না।

পেয়েছ সাধের মানব জনম

চুরাশিলক্ষ যোনি করে ভ্রমণ

এ তো রিপু সেবার জনম নয় রে

শৃগাল কুক্কুরের মত "

এ যে সুদুর্লভ হরিভজনের জনম

তাই মানুষ জনম পাওয়ার পরে আর দেরী করা যাবে না, যা গেছে তা গেছে, যা আছে সামাল তা। মহাজন বলেন এখনও ফিরে বস ভাই। আজ থেকে সংকল্প করে এই নামমালা কণ্ঠহার কর, আর আক্ষেপ করতে হবে না।

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা—জন্মতিথি

শ্রীল বাবাজী মহারাজের একান্ত আস্বাদনের স্বরূপ হলেন রসময় গৌরকিশোর। তাঁর শুভ আবির্ভাব তিথি শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথি। এই তিথি পরম-পাবনী তিথি। যে তিথি পরমদয়াল পতিতপাবন অবতারকে এই ধরাধামে আবির্ভূত করিয়েছেন কলিহত দুর্গত পতিত জীবের প্রতি অযাচিত করুণায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি হলেন হোলী তিথি। এই দোলপূর্ণিমা তিথিকে অঙ্গীকার ক'রে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হলেন, এর একটি তাৎপর্য্য আছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকে শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ শ্রীগৌরস্বরূপটি এঁকেছেন—

> সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
> মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
> বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
> স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

গৌরসুন্দরকে বলা হয়েছে প্রেমের বিনির্য্যাস। মদন এবং মোহন দশা পর্য্যন্ত নির্য্যাস বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু 'বি' উপসর্গটি বেশী দেওয়া হয়েছে। বি নির্য্যাস অর্থাৎ বিশেষ নির্য্যাস। সাধক যে সাধন করে তার ফল প্রেম পর্য্যন্ত। এই প্রেম লাভ হ'লে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়। এই প্রেমের পরে পরে যে অবস্থা তা সাধক হৃদয়ে হয় না। সে সব ভাব নিত্যসিদ্ধ পরিকরকে আশ্রয় ক'রে থাকে। প্রেম নির্য্যাস হ'ল স্নেহ, স্নেহ নির্য্যাস মান, মান নির্য্যাস প্রণয়, প্রণয় নির্য্যাস রাগ, রাগ নির্য্যাস অনুরাগ, অনুরাগ নির্য্যাস ভাব, ভাব নির্য্যাস মহাভাব—এই মহাভাব স্বরূপিনী রাধাঠাকুরাণী। মহাভাব আবার দুই প্রকার—রূঢ় মহ্যভাব আর অধিরূঢ় মহাভাব। রূঢ় মহাভাব দ্বারকার মহিষীদের—আর অধিরূঢ় মহাভাব গোপিকার

গণে। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুই প্রকার—মাদন এবং মোহন। কৃষ্ণমিলিত অবস্থার নাম মাদন এবং কৃষ্ণবিরহ অবস্থার নাম মোহন। মহিষীগণ গোপিকার ভাব কল্পনা করতে পারেন না। কারণ এই দুই-এর মধ্যে মহান্ পার্থক্য। দুই-এই মধ্যে স্বকীয়া পরকীয়ার প্রাচীর। মহিষীদের স্বকীয়া ভাব। শাস্ত্রের বিধিবিধান মেনে কৃষ্ণ-সম্ভোগ আর গোপরামাদের পরকীয়া—শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করেই তাদের কৃষ্ণ সম্ভোগ। ধর্ম রক্ষা ক'রে মহিষীগণ কৃষ্ণ পেতে চায় আর গোপী শুধু কৃষ্ণ পেতে চায়—তার জন্য ধর্ম রক্ষা হোক আর না হোক সেদিকে তাদের লক্ষ্য নেই। কৃষ্ণ পাওয়ার পক্ষে যত রকমের বাধা হ'তে পারে সবই গোপীর পক্ষে দেখান হয়েছে তাদের কৃষ্ণলাভের উৎকণ্ঠার প্রাবল্য দেখাবার জন্য। বাধার প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে গোপী-কৃষ্ণ তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে ছুটেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গম্ভীরার গুপ্ত গৃহে আছেন তখন সেখানেও বাধার প্রাচীর গোস্বামিপাদ বর্ণনা করেছেন—

তিন দ্বার আছে রুদ্ধ তিন ভিত্তি উচ্চ ঊর্দ্ধ
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গা গাই-এর মাঝে দেখি গোরা রসরাজে
পড়িয়াছে শ্বাস নাহি চলে॥

আবেশেই একমাত্র বাধার প্রাচীর লঙ্ঘন করা যায়।

মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীমতী রাধারাণী—এই মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র রাধারাণীতেই থাকে। পূর্ব্বরাগ থেকে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান পর্য্যন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম কানে শোনা থেকে আরম্ভ ক'রে মিলনের চরমদশা পর্য্যন্ত যত যত অবস্থা হ'তে পারে সবগুলি যুগপৎ রাধারাণীর স্বরূপে প্রকাশিত। এই মাদনাখ্য মহাভাবের লক্ষণ করলেন—

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

অর্থাৎ রাধারাণীতেই মাদনাখ্য মহাভাব বিরাজ করে, রাধারাণী ছাড়া অন্য কোথাও যায় না। পূর্ব্বরাগের অবস্থা যে মিলনের চরম অবস্থাতেও থাকে—এও বড় বিচিত্র। প্রেমের পরে পরে যে যে অবস্থা সবই কৃষ্ণ-অনুরাগের ক্ষুধা। এই ক্ষুধার আবার তারতম্য আছে। যে ক্ষুধায় কৃষ্ণ আস্বাদন যত বেশী সে ক্ষুধার তত দাম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাধারাণীর কান্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়। মাদনাখ্য মহাভাবকে প্রেমের পরাৎপর অবস্থা বলা হয়েছে। এ পর্য্যন্ত হ'ল প্রেমের নির্য্যাস। এরও পরের অবস্থা বিনির্য্যাস। বিনির্য্যাস হ'ল বিবর্ত্তবিলাস মাদনাখ্য মহাভাববতী রাধারাণী এবং রসরাজ শ্রীগোবিন্দ। এঁদের যে মোহন অবস্থা এটি ব্রহ্মাণ্ডক্ষুব্ধকারিণী। বিরহ অবস্থায় রাধারাণী নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রাখেন, কারণ তাঁর নিঃশ্বাসের এত তাপ যে নিঃশ্বাস ফেললে সে তাপে জগৎ জ্ব'লে যাবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের বিরহতাপে পাথর গলেছে! জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে আজও তার সাক্ষী আছে।

বিবর্ত্তবিলাস অবস্থা—রাধারাণী কৃষ্ণ ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণ হয়েছেন এবং কৃষ্ণ রাধা ভাবতে ভাবতে রাধা হয়েছেন। এখন যে রাধা দেখা যাচ্ছে তিনি রাধা নন আসলে কৃষ্ণ আর যে কৃষ্ণ দেখা যাচ্ছে তিনি কৃষ্ণ নন—প্রকৃতপক্ষে রাধা। রাধার যেমন অবস্থা কৃষ্ণের অবস্থাও তাই। রসের আশ্রয়জাতি রাধারাণী এবং বিষয়জাতি কৃষ্ণচন্দ্র। আশ্রয় এবং বিষয়জাতি যদি একরকম না হয় তাহলে রস বেশ সুরস হয় না। কৃষ্ণের রাধাভাবাঢ্য অবস্থা—ভিতর বাহির তার রাধাময় কৃষ্ণ রাধাভাবে বিভাবিত। ইনিই তো গৌর স্বরূপ। প্রেমের রঙ হ'ল হিঙ্গুলবর্ণ। তাই তো লালরঙে হোলিখেলা হয়। হোলিখেলা নয়—হোলিযুদ্ধ। রঙের যুদ্ধ। রঙের যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে শ্যামসুন্দর রাধারাণীর অঞ্চল তলে আশ্রয় নিচ্ছেন। এ বড় বিচিত্র। সব জগৎ যাঁর চরণে আশ্রয় নেয়—লীলার এমনই মর্য্যাদা যে সেই শ্যামসুন্দর নিজেই আশ্রয় চাইছেন।

হোলির প্রকৃত তত্ত্ব কি ? হোলিখেলার উপকরণ কি ? উপকরণ হ'ল অনুরাগ। ব্রহ্মা শিব সনকাদি এ খেলার সন্ধান জানেন না। অনুরাগ উপকরণে কৃষ্ণ সঙ্গে গোপীগণ খেলায় মত্ত। কিন্তু এ অনুরাগ তো ভিতরের কথা। এ তো বাইরে লোকে বুঝবে না। বাইরেও তো খেলার উপকরণ চাই। বাইরের উপকরণ ঐ অনুরাগের প্রতীক হিসাবে নেওয়া হয়েছে ফাগু, কুংকুম রং। অনুরাগের রং লাল তাই রং ফাগু আবীরের রং লাল। হোলিখেলা মানে দুই অনুরাগের খেলা। কৃষ্ণ অনুরাগ ও গোপী অনুরাগ। তাই বাইরে এত ফাগু আবীর রং-এর ছড়াছড়ি। গৌর হলেন এই অনুরাগের মূর্ত্তি। তাই এই হোলিতিথিতে গৌর আবির্ভাব।

শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী আনন্দিনী শক্তি হ্লাদিনী শক্তি, আর রসরাজ শ্রীগোবিন্দ হলেন আনন্দঘনস্বরূপ। রাধাকৃষ্ণ দুটি আনন্দের পুতুল একীভূত হ'য়ে গৌরস্বরূপে প্রকাশ।

কলিজীবকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান

শাস্ত্রে বলা আছে—শাস্ত্রে কুশল হলেও যদি পরব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞান না থাকে তাহলে পরিশ্রম বৃথা। এইটিই বুঝাবার জন্য সকল অবতারগণের আবির্ভাব। শ্রীগোবিন্দও গীতাবাক্যে বলেছেন—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ —গীতা ১৫।১৫

অবতারগণের আবির্ভাবে, ভগবানের বাক্যে, শাস্ত্রবাণীতে জগতের মুষ্টিমেয় লোকের কল্যাণ হয়েছে কিন্তু আমার তো কোন কল্যাণ হয়নি—আমি তো যা ছিলাম তাই আছি। শাস্ত্রবাক্য থাকলেও কোন কাজ হয় না। কারণ এই শাস্ত্রবাক্য পালন করবার মত লোক উদাহরণ স্বরূপ মানুষ চোখে দেখতে চায়। এইরকম উদাহরণ দেখতে পেলে তবে লোভ হবে। উদাহরণ না দেখতে পেলে রুচি কাজে লাগে না। বর্দ্ধিত লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে মানুষ অন্যায়ও ক'রে ফেলে আর লোভ জাগলে ন্যায় গৌরগোবিন্দ ভজন করবে না? যিনি গৌরগোবিন্দ ভজনে লোভ জাগাতে পারেন তিনিই সাধু, তিনিই মহাপুরুষ। কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতা মতি কিনবার কথা বলা আছে। সেটি কিনবার মূল্য হ'ল একমাত্র লোভ। কিন্তু হরিভক্তিতে লোভ তো কোটি জন্মের সুকৃতিতেও মেলে না—মহৎকৃপালভ্য বস্তু হ'ল এই লোভ। মহৎকৃপায় এই লোভ পেলে মহৎকে তার মূল্য দিতে হয়! মূল্য কি? কৃতজ্ঞতাই একমাত্র মূল্য। কৃতজ্ঞতা কি? "জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে" কোটি জন্মের সুকৃতিতেও এই লোভ লাভ হয় না, এই বোধে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। দ্বাপর-যুগের শেষে গীতা, ভাগবত শাস্ত্র কলিজীবের জন্য প্রকাশিত হ'ল—শুধু শাস্ত্রে কিন্তু কাজ হবে না। শাস্ত্র আচরণকারী ব্যক্তি দেখলে তবে লোভ হবে। তখন মনে হবে আমরা কবে এমন ক'রে গৌরগোবিন্দ ব'লে কাঁদব? এইরকম

লোভ যখন জাগবে তখন কাজ হবে। ধর্ম শুধু বুঝালে কাজ হবে না।

ভগবান যে জগৎ সৃষ্টি করলেন, এ সৃষ্টির সার্থকতা কোথায় ? তাঁর থেকেই সৃষ্টি, তাঁতেই স্থিতি আবার তাঁতেই লয়। অনাদি কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণ উন্মুখ করবার জন্যই এই সৃষ্টিকাজ। সৃষ্টিতে না আনলে জীব কোন কাজের অবসর পায় না। চুরাশী লক্ষ যোনিতে জীবকে ভ্রমণ করান, এটি ভগবানের অনন্ত করুণার পরিচয়। জীবকে দুর্দ্দশা ভোগ করান, লাঞ্ছনা ভোগ করান ভগবানের উদ্দেশ্য নয়। নিজ পাদপদ্ম দান করাই ভগবানের লক্ষ্য। শিশু নিদ্রিত হ'লে পিতা তাকে ডেকে তুলে কাঁদিয়েই যেমন ক্ষীর ভোজন করান, তেমনি অনাদি কৃষ্ণবিমুখ জীবকে নিদ্রা হ'তে জাগিয়ে মায়ার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়ে কাঁদিয়েই নিজ পাদপদ্মমাধুর্য্যরূপ ক্ষীর খাওয়াতে হবে। চুরাশি লক্ষ যোনিতে যে জীব ঘুরছে এর একটি উপকারিতা আছে। এই চুরাশি লক্ষ জন্মে জীবের রসপিপাসা জেগেছে। রসতৃষ্ণা তার ক্রমশঃ বাড়ে। রসতৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া প্রাকৃত রসের লক্ষণ নয়। কারণ প্রাকৃত রসভোগে রসতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। ভোগে তৃপ্তি না হ'য়ে উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বৃদ্ধি এ হ'ল অপ্রাকৃত রসের স্বভাব। অপ্রাকৃতরস শ্রীগোবিন্দকে ধরবে ব'লে প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে এই অতৃপ্তিটি দেওয়া হয়েছে। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত রসপিপাসার বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবের চুরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ। এর ফলে জীব যে সম্পত্তি লাভ করেছে এইটিই তাকে উত্তরকালে ভগবানের পাদপদ্ম পাইয়ে দেবে। স্রোত থাকলে তবে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, আর স্রোত বন্ধ হ'য়ে গেলে আর ঘোরান যায় না। তেমনি রসপিপাসা থাকলে তবে তার মোড় ঘোরান যায়—কিন্তু অন্য কোন উপায়ে তার মোড় ঘোরান যায় না। তাই মায়ার গর্ভে জীবকে নিক্ষেপ ক'রে দুঃখ দেওয়া ভগবানের উদ্দেশ্য নয়। ভগবান ভেবেছিলেন—ক্রমোন্মুখ দশায় অর্থাৎ জীব যত উঁচুস্তরের জন্ম

পাবে ততই ক্রমে সে হিতাহিত বিচার ক'রে নিতে পারবে। জীব কিন্তু তা করতে পারল না। শাস্ত্র প্রকাশিত হয়েছেন, সাধুরাও এসেছেন, সবই হয়েছে কিন্তু জীবের দুর্গতি তো দূর হ'ল না। জীব যে দুঃখকবলিত, সেই অবস্থাতেই রইল! ভগবান তাঁর নিজের আসনে থেকে জীবের দিকে তাঁর শাস্ত্ররূপ কথা ছুঁড়ে দিলেন, এতে কাজ হবে না। জীবের কাছে জীবের মত হ'য়ে না এলে হবে না। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলেছেন—'পতিত দেখিয়া কে বা উঠিবে কাঁদিয়া'—ভগবানকে জীবের সান্নিধ্যে যেতে হবে। এ শুধু উপদেশের কাজ নয়, প্রত্যক্ষ হ'তে হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মুখ্য কারণ হ'ল এখানে জীব প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে পেয়েছে। এটি আর কোন জায়গায় নেই। সব শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য জীব ভগবানকে পাবে। মহাপ্রভুর অবতারে পতিত ছাঁকা হয়েছে। অন্যযুগে সকলে পায় নি। ভগবান জীবকে না পাওয়ালে জীব ভগবানকে পায় না। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে একাদশস্কন্ধে যুগাবতার প্রসঙ্গে স্তুতি করতে গিয়ে শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র বললেন —সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীকে ত্যাগ ক'রে ভগবান রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন। এখানে সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী। রাজধাতুর মানে দীপ্তি পাওয়া। গৌর সঙ্গে প্রিয়াজী নিত্য মিলিত থাকুন এটি দেবতাদেরও আকাঙ্ক্ষিত—এইটিই পরম শোভা। অরণ্য বলতে চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস বুঝায়। ধর্ম্মিষ্ঠ গৌরসুন্দর তাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সংসারের বৈকল্য দেখে এ সন্ন্যাস গ্রহণ নয়। দয়িতয়া দয়ার ভাব অর্থাৎ দয়ালুতা, এই দয়ালুতার অভিলষিত হ'ল মায়ামৃগ। মায়াকে অন্বেষণ করে যে সে মায়ামৃগ অর্থাৎ কলিজীব। এই কলিজীবই দয়ালুতার ঈপ্সিত। দয়ালুতা অর্থাৎ কৃপারাণী নিজে মায়ামৃগ যে কলিজীব তাকে ঈপ্সা করে। কৃপা সব সময় পতিতকে চায়। পতিতেই কৃপা ফলবতী হয়। কৃপার গতি অভিমানীতে নয়, সেখানে কৃপা বন্ধ্যা। দয়ালুতার প্রতিমূর্ত্তি

কৃপার প্রতিমূর্ত্তি হলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। সাধনভজনবিহীন কলিজীবের পিছু পিছু তাই ছুটছেন। কলিজীব আগে আগে চলেছে—আর তার পিছনে চলেছেন ভগবান নিজে। ভগবানের এই স্বরূপ উদ্ধবজীও বাঞ্ছা করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই গোপীপ্রেম আঁচলে ক'রে পতিত কলিজীবকে দিবার জন্য পতিত জীবের পিছু পিছু ছুটেছেন। গৌর বলছেন বিনামূল্যে দিব। সেই গৌরপাদপদ্ম আশ্রয় করি।

গৌর অবতার কেন হয়েছে তার অনেক কারণ আছে। ভগবৎ-জ্ঞানের জন্য, বিষয়ভোগের জন্য, ভগবানকে ভোগ করবার জন্য জীব ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। ভগবৎ পাদপদ্ম স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত পথক্লেশের সাফল্য নেই। অন্যযুগে ভগবানকে পাবার জন্য জীবকে ছুটতে হয়েছে আর এই ধন্য কলিযুগে জীব পালাচ্ছে আর অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ সর্ব্ব-কারণকারণম্ ব'লে ব্রহ্মা যাঁকে স্তুতি করেছেন সেই গৌর ভগবান তাদের পিছনে পিছনে ছুটছেন। এই হ'ল কলিযুগাবতারের স্বরূপ।

উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর শ্রীহট্ট হ'তে শ্রীধাম নবদ্বীপে এসে বাস করেন। জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবী যখনই সন্তানসম্ভবা হ'ন, মহাবিষ্ণু অবতার জগৎকর্ত্তা শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তখনই মনে করেন বুঝি আমার প্রভু এসেছেন—এই ভেবে শচীদেবীকে পরিক্রমা ক'রে প্রণাম ক'রে চলে যান—তার পরেই সে সন্তানটি বিনষ্ট হ'য়ে যায়। এইভাবে আটটি সন্তান পর পর বিনষ্ট হয়। অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার—তাঁর প্রণাম এঁরা সহ্য করতে পারেন না। ভগবানের আবির্ভাবের আগে ভগবানের পার্ষদ আবির্ভূত হ'ন। তাঁরা প্রায়ই শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মহাজন বলেছেন—

জাতিকুল নিরর্থক বুঝাবার তরে।
ঠাকুর হরিদাস জন্ম নিলেন যবনের ঘরে॥
ভকত কল্পতরু, অন্তরে অন্তরু, রোপলি ঠাঁমহি ঠাম।

অদ্বৈত-আচার্য্যের সভায় ভাগবতরস আস্বাদন হয়। ভক্তাবতার শ্রীবাস পণ্ডিত ও অদ্বৈত আচার্য্যের বড় আক্ষেপ—কেউ কৃষ্ণ বলে না। শ্রীবাস পণ্ডিত আচার্য্যের কাছে কেঁদে বললেন। আচার্য্যের প্রেম হুঙ্কারে রং ফিরিয়ে ঢঙ্ ফিরিয়ে ভগবানকে আসতে হ'ল। শ্রীগৌরসুন্দর নিজেই বলেছেন—

শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীরোদ সাগরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে॥

নাঢ়া আমায় দিল নাড়া। অদ্বৈত আচার্য্য জেনেছেন প্রভু আসবেন, তাই শান্তি পেয়েছেন। শচী মায়ের আটটি সন্তান বিনষ্ট হওয়ার পর আবির্ভাব হয়েছে বিশ্বরূপের। ইনি বিশ্বম্ভরের অগ্রজ। সবশেষে আবির্ভাব বিশ্বম্ভরের, নদীয়ার নিমাই-এর।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মবিবরণ দিয়েছেন, তের মাস মায়ের গর্ভে ছিলেন। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীনিমাইচাঁদ আবির্ভূত হ'ন। ত্রিভুবনের সকল শুভ সংযোগ সেই সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। ভুবন-মঙ্গলের আবির্ভাবে সকল অশুভ দূরীভূত হয়েছে। শাস্ত্রে বলা আছে—রাহুগ্রস্ত পূর্ণিমা তিথিতে গৌরাঙ্গ প্রকট হবেন। গৌরসুন্দর যুগাবতার এবং প্রেমাবতার দুইই। নিজে যুগধর্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন আচরণ ক'রে উপদেশ করেছেন তাই যুগাবতার, আর নামের মাধ্যমে প্রেমদান করেছেন ব'লে প্রেমাবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন—

আমি চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
এই ভক্তি বিনু জগতের নাহি অবস্থান॥

যে যত দরিদ্র, সেখানে দয়া তত উৎফুল্লভাবে প্রকাশ পায়। সাধন সম্পত্তিতে যে অত্যন্ত নিঃস্ব, তাকে কৃপা করাই হ'ল কৃপার সার্থকতা। রাধারাণীর যে কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদ আর কৃষ্ণের যে রাধাপ্রেমের আস্বাদ, এটি মুকুন্দ মহিষীদের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্লভ। চন্দ্র যখন রাহুগ্রস্ত সেই পূর্ণিমা সন্ধ্যায় গৌর আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বর্ণনা করলেন—

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কি বা প্রয়োজন॥

কলঙ্কী চাঁদ তাই অভিমানে মুখ লুকিয়েছে। মহাপ্রভু যে যুগাবতার, এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়—কিন্তু চিরকালের অনর্পিত প্রেমদানই গৌর অবতারের বৈশিষ্ট্য। মহাজন বলেছেন—

কলিঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম গেল দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপে সকল অবতার এসে মিলেছেন। কারণ বলা আছে—

স্বয়ং ভগবানের অবতার হয় যেই কালে।
আর আর অবতার তাতে আসি মিলে॥

তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্যই গোবিন্দের গৌর অবতার। এইটিই মুখ্য কারণ বা অন্তরঙ্গ কারণ। এইটিই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিচরণ বললেন শ্রীল স্বরূপ দামোদরজীর কড়চার অনুবাদ করে—

কৈছন রাধাপ্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তিঁহ ভোর।

এ তিনটিই রসগত বা ভাবগত বাসনা। তত্ত্বগত বাসনা নয়।

কারণ তত্ত্বগতবাসনা তত্ত্বশিরোমণি ব্রজেন্দ্রনন্দনে জাগতেই পারে না। কারণ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তাঁকে পূর্ণ পূর্ণতম ব'লে উল্লেখ করেছেন। রাধারাণীর প্রেম আস্বাদন করতে চেয়েছেন শ্রীগোবিন্দ, এটি আশ্রয়জাতীয় আস্বাদন। তাই বিষয়জাতি শ্রীগোবিন্দের পক্ষে বিজাতীয় বাসনা। রাধারাণীর হৃদয় বুঝতে হ'লে রাধারাণী হ'তে হবে। অর্থাৎ রাধারাণীর হৃদয় পেতে হবে।

হ'ল শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম
দিতে রাধাপ্রেমের প্রতিদান
হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
আস্বাদিতে রাধার প্রেম মর্ম্ম
প্রচারিতে নিজ নামধর্ম।

রাধারাণীর প্রেম আস্বাদনই গৌর অবতারের মুখ্য কারণ। আনুসঙ্গে কলিজীবকে নাম-প্রেম দান করেছেন। কারণ রাধারাণী কৃপাময়ী। কৃষ্ণ জানেন যদি পরোপকার করি, তাহলে রাধারাণী ঋণ শোধ ক'রে দেবেন। বলেছেন—

কলিজীব হরি বলি প্রেমে নাচবে যত।
আমার রাধাপ্রেমের ঋণ শোধ হবে তত॥

পদকর্ত্তা শ্রীল লোচন দাসজী বললেন—

অবতার সার গোরা অবতার।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন—

গৌর আমার বড় অবতার।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে গৌর বড় অবতার কেন? শ্রীপাদ উত্তর দিয়েছেন কীর্ত্তনের মাধ্যমে—

গৌর আমার বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥

শ্রীসংকীর্ত্তন পিতা শ্রীগৌরহরি যে সংকীর্ত্তনের অবতার, এটি জগৎকে জানাবার জন্যই জন্মকালে গ্রহণ ছলে জগতে সংকীর্ত্তনের

প্রচার করলেন। সংকীর্ত্তন সহযোগেই গৌরের জন্ম। এই সংকীর্ত্তনই গৌর প্রচার করলেন। নাম-সংকীর্ত্তন যজ্ঞেই গৌর উপাসনা, গৌর আরাধনা, গৌর সেবা। তাই সংকীর্ত্তন অবলম্বন করলেই গৌর পাওয়া যাবে। জন্মগ্রহণ কালে চাঁদে রাহুগ্রাস, গ্রহণ ছলে যবনেও ঠাট্টা ছলে হরি হরি বলে। আজ শুভলগ্নে গৌর আবির্ভাব হ'ল।

সমাপ্ত